ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মনের অসুখ

প্রথম পর্ব

বি চি ত্রা

প্রথম প্রকাশ
২৫ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রকাশক
সুরেখা পোদ্দার
বিচিত্রা
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

পরিবেশক
আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ঊর্মি গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

ভূ মি কা

মন কথাটি আমরা নানা অর্থে নানাভাবে ব্যবহার করি। 'ভুলো না মনে রেখো', 'মন দিয়ে পড়লে ঠিক পাশ করবে', 'মনটা আজ ভাল নেই', 'যদি কিছু মনে না করেন', 'চিতার আগুন নিভবে বটে কিন্তু মনের আগুন নিভবে না',—মনের আলাদা অর্থ, আলাদা তাৎপর্যের নমুনা। কমলাকান্তের মন চুরির কাহিনীতে মন আবার কিছুটা স্বতন্ত্র অর্থবহ! ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পিত ভক্তের মন আর কাঙ্ক্ষিতের করকমলে অর্পিত প্রেমিকার 'মন' কি এক? মন কি? এই প্রশ্নের অন্তত আঠারো রকমের উত্তর পাবেন। মনের অবস্থান কোথায়? যাত্রা থিয়েটারে অভিনেতারা ডান হাতটা বাঁদিকের বুকে ঠেকিয়ে মনের অবস্থান নির্দেশ করেন। তা থেকে অনেকের ধারণা মনের অবস্থান বুকের খাঁচার মধ্যে কোনো এক জায়গায়— হয়ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। মস্তিষ্কে অবস্থিত একটা ছোট গ্রন্থিকে (পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড) এক সময় মনের আধার ভাবা হত। আজকাল মনস্তাত্ত্বিকদের একদলের মতে মস্তিষ্কই মনের বস্তুগত অধঃস্তর, আবার একদল বলেন —মনের অবস্থাননির্ণয় নিরর্থক, তার প্রকোষ্ঠভিত্তিক সংগঠন জানলেই মানসিকতার ব্যাখ্যা করা যায়। এইসব তত্ত্বগত কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা মনের, বিশেষ করে অস্বাভাবিক মনের কিছু কিছু কার্যকলাপের বিবরণের ভিতর দিয়ে মনের বৈচিত্র্য ও রহস্য বোঝার চেষ্টা করব; বলে রাখা উচিত—বিবরণগুলো কল্পকাহিনী নয়, বাস্তব জীবনের ঘটনা। ঘটনার পাত্রপাত্রীরা অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিলেন। কাহিনীগুলো 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ব-পিপাসুদের জন্য

নয়, গল্প-পিপাসুদের জন্য। তাই সাধ্যমত অলঙ্করণের চেষ্টা এবং এমনভাবে লেখা যাতে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় গোপন থাকে, তাঁদের একান্ত আপনজনও যাতে চিনতে না পারেন।

প্রথম পর্বের কাহিনীগুলো প্রধানত দাম্পত্যজীবনের প্রেম-ভালবাসা সংক্রান্ত। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির দরুন অনেক সময় এক পক্ষের মনের অসুখ দেখা দিতে পারে। (সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আজকের পৃথিবীতে প্রেম ভালবাসার মত সদর্থক প্রক্ষোভ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। ঘৃণা-বিদ্বেষ হিংসার মত নঙর্থক প্রক্ষোভের প্রসার ও তীব্রতা বাড়ছে।) প্রেম আর ভূতপ্রেত সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়, অনেক কিছু লেখা হয় বটে, কিন্তু খাঁটি প্রেম ভূতের মতই দুর্লভ কথাগুলো বলেছেন একজন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। এঁদের মতে পুরোপুরি সায় না দিয়েও বলা চলে, প্রক্ষোভ-সমস্যা নিশ্চয়ই এক গুরুতর সমস্যা। (কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রক্ষোভ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। সদর্থক, নঙর্থক— দুই জাতীয় প্রক্ষোভ সম্পর্কে ঐ একই কথা।) (প্রেম শ্রেষ্ঠ সদর্থক প্রক্ষোভ।) জৈব প্রয়োজন মেটাবার পরই ব্যক্তিমাত্রেই চায় নিরাপত্তা ও ভালবাসা। এই ভালবাসা সম্পর্কে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব কমই হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি· 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে'--বাইবেলের-এই অনুশাসন কিভাবে কার্যকর করা যায়? তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, তার সঙ্গে ভাববিনিময় করে? তার অভাব অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে? অভাব দূর করার মত সঙ্গতি আমার যদি না থাকে, তবে কিভাবে তাকে বোঝাবো যে আমি তাকে ভালবাসি। অভাব অভিযোগ মিটিয়েও কি বিদ্যাসাগর মশাই বোঝাতে পেরেছিলেন যে তিনি প্রতিবেশীদের ভালবাসেন? অনেক স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে তাঁদের মনেও এই ধরনের চিন্তা: কি করে বোঝাবো যে আমি তাকে ভালবাসি। (স্বামীরা ভাবেন নিয়মিত শাড়ী গয়না দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর মনের নাগাল পাচ্ছেন না; আর স্ত্রীরা মনে করেন, সব

ব্যাপারে স্বামীর মতে মত দিয়ে, মন জুগিয়ে চলেও স্বামীর ভালবাসা পাচ্ছেন না। সন্তান ও মাতাপিতার ভালবাসার ব্যাপারেও ঐ একই সমস্যা। অনেক বাপ-মা ছেলেমেয়েদের জন্যে সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকম ব্যবস্থা করেও তাদের বোঝাতে পারেন না যে তাঁরা তাদের ভালবাসেন। তারা ভালবাসার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে এবং অনেক সময় এর ফলে তাদের বিদ্বিষ্ট মন ক্রমশ খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গরীবের ঘরের শিশু জামাকাপড় খাবারদাবার খেলনা দরকারমত পায় না বলে ভাবতে পারে বাবা মা ভালবাসে না। কিন্তু যে শিশু চাওয়ার আগেই সব কিছু হাতের কাছে পায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছু পায়—সে কেন মনে করে বাবামা ভালবাসে না? এই 'কেন'র উত্তরে আপাতত একটা কথা বলে রাখি। ভালবাসা ও আনুষঙ্গিক সবরকমের প্রক্ষোভ সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করেছি প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসন, গল্প উপন্যাস, লোকগীতি ও রূপকথা থেকে। আজকাল অবশ্য সিনেমা, রেডিও, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন আমাদের প্রধান শিক্ষক। বলা বাহুল্য, এদের কোনোটিই বিশ্বাস-যোগ্য বা নির্ভরযোগ্য শিক্ষার উৎস নয়। প্রক্ষোভ সম্পর্কে মামুলি ধারণা পরিবেশন করে আজকের এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যুগে, এই দ্রুত-পরিবর্তনশীল সমাজে দাম্পত্য-সমস্যা মিটবে না, শিশুদের সুস্থ ও শান্ত রাখা যাবে না, প্রক্ষোভ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে যা বললাম, অন্যান্য প্রক্ষোভ সম্পর্কেও অনায়াসে তাই বলা চলে। মনের রোগের চিকিৎসায় যুক্তিবাদী চিকিৎসকদের প্রাথমিক কর্তব্য প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধে রোগীদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া ও তাঁদের মনে যুগোপযোগী ধ্যানধারণা গড়ে তোলা।

অসুস্থ দাম্পত্যজীবন, মাতাপিতা ও শিশুদের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস—বলতে গেলে বেশির ভাগ অস্বভাবী মানসিকতা বিস্তারের মূলে রয়েছে সামাজিক অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ববিরোধের ক্রমবৃদ্ধি। ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক বিশৃংখলার ছায়াপাত হবেই। মনের অসুখ

সারাতে হলে বা বিস্তার রোধ করতে হলে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্ক, নরনারী সম্পর্ক এবং পিতামাতা ও শিশুর সম্পর্কের বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রয়োজন।

ঐতিহ্য অনুস্মৃতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কালধর্মানুযায়ী সামাজিক সম্পর্কের নতুন বিন্যাস ও নতুন মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে। যদিও বাস্তবজীবনের এই কাহিনীগুলো মূলত গল্পপিপাসুদের জন্যে লেখা, তবুও আশা করছি পাঠকদের মনে কাহিনীগুলো প্রশ্ন জাগাবে।

প্রকাশকদের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও বইটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল রয়ে গেছে। ১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে 'ইডিপাস রেকস ও ইলেকট্রা'র পর 'নাটকে' শব্দটি বাদ গেছে। 'অস্বাভাবিক' কথাটির আগে 'নাটকে' শব্দটি বসিয়ে নিলে অর্থ পরিষ্কার হবে।

পৃষ্ঠা ২৭-এর তিন নম্বর কাহিনীর শিরোনামায় লেখা কয়েকটি কবিতার লাইন বাদ পড়ে গেছে। লাইন ক'টি উদ্ধৃত করছি :

Two peop'e who know / They do not understand each other / Breeding childern whom / They do not understand / And who will never understand them.

—T. S. Elliot

৮৮ পাতার ১৪ লাইনে খুসী মা'র বদলে হবে 'খুসী না'। এবং ১১৭ পাতার ২৩ লাইনে 'এ্যাসটি' শব্দটির বদলে হবে 'এ্যাসার্ট'।

এই ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই এখন করার নেই। দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে এবং এ ধরনের ভুল যাতে না থাকে সেদিকে প্রকাশক নজর দেবেন আশা করছি।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
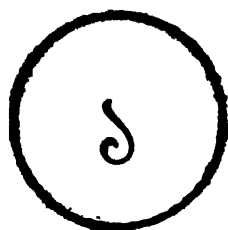
অধ্যাপক-দম্পতি তাঁদের দশ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। ছেলেটিকে দেখতে সুশ্রী, স্বাস্থ্যও ভাল। মুস্কিল দেহ নিয়ে নয়, মন নিয়ে। তিন বছর আগেও এই পুত্রটির জন্মে তাঁরা গর্ব অনুভব করতেন। স্কুলের শিক্ষকেরা অধ্যাপক-দম্পতিকে স্পষ্টই বলতেন: বেঁচে থাকলে ছেলেটি আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অলক অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের অঙ্ক অনায়াসে করতে পারে, নির্ভুল ইংরিজি লিখতে পারে। বাড়ীতে বাবা পড়াতেন অঙ্ক, মা ইংরিজি। স্কুলের পড়া শেষ করে বাবার কাছে সে উঁচু ক্লাসের অঙ্ক শিখত, মায়ের কাছে বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা নামকরা উপন্যাসের কাহিনী শুনত। গোলমাল বেঁধেছে ঠিক তিন বছর আগে থেকে, ছোট বোনটির জন্মের মাস ছয়েক পর থেকে। অলক পড়াশুনায় ক্রমশ অমনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল, নানা অছিলায় স্কুল কামাই করতে আরম্ভ করল। জোর করে স্কুলে দিয়ে এলেন বাবা। কিছু দিন পরে জানলেন ছেলে স্কুল পালিয়ে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ খারাপ সিনেমা দেখছে। মায়ের ব্যাগ থেকে

পয়সা সরাচ্ছে, এটাও বোঝা গেল। পরীক্ষার ফল হল খুব খারাপ। স্কুল বদলানো হল, কিন্তু ছেলের মন বদলালো না। মা-বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এর আগে যাকে কোনো দিন একটি কড়া কথা বলার প্রয়োজন হয় নি, তাকে বকলেন, ভয় দেখালেন : চড়-চাপড়ও দিতে লাগলেন। এর ফলে তার দুষ্টুমি-নষ্টামি বেড়েই চলল। স্কুলে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিল। মা-বাবার চোখের সামনেই ছোট বোনটাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে লাগল। ঘুমন্ত শিশুটিকে খোঁচা মেরে, চিমটি কেটে কাঁদাতে পারলে তার চোখমুখে একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠত, অন্য সময় সেই সাত-আট বছরের ছেলেটির মুখেচোখে দেখা যেত অপ্রসন্ন বিরক্তির ভাব। পাছে বাচ্চাটির কোনো ক্ষতি করে—এই ভয়ে পালা করে বাবা এবং মা কলেজ কামাই করে শিশুকন্যার পাহারায় থাকতেন। কিন্তু এমন ভাবে তো চিরকাল চলে না। বাড়ীতে বাচ্চাটিকে দেখাশুনার জন্যে মাঝবয়সী যে বিধবাটি ছিলেন, তাঁকে অলক আদৌ সমীহ করত না। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় অলকের মা অলকের তত্ত্বাবধানের জন্য দেশ থেকে স্বামীর এক বৃদ্ধা পিসীকে নিয়ে আসেন। তিনি মাস কয়েক থেকে দেশে ফিরে গেছেন। উপায়ান্তর না দেখে বাবা-মা অলককে একটা ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রেখে কলেজ যেতে শুরু করলেন। এর পর তাকে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কড়া তাগিদে ঘরের ছেলেকে আবার তাঁরা ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন। সমস্যার সমাধান হল না। উপরন্তু দেখা গেল কয়েক মাস বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা হয়ে সে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েছে। বাবা-মা প্রমাদ গনলেন। অনেক বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ নিলেন, অনেক চিকিৎসকের কাছে দরবার করলেন। এবং দু'বছরে এ সম্পর্কিত যাবতীয় লিটারেচার পড়ে শেষ করলেন অধ্যাপক-দম্পতি। সেই সঙ্গে বন্ধুদের পরামর্শে, চিকিৎসকদের সদুপদেশে ও বিভিন্ন দেশের মনস্তাত্ত্বিকদের নির্দেশানু-

যায়ী শায়েস্তা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না।

কেন ফল হল না? বাবা, মা ও অলকের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা বলার ফলে খানিকটা তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবা ও মা প্রায় একই ধরনের কথা বললেন। তাঁদের মধ্যে সব বিষয়েই মতৈক্য। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই রকম: অলক সবদিক থেকে আদর্শ বালক ছিল। আদর্শ বালক হিসেবেই সে বেড়ে উঠতো যদি না আমরা পিসীকে দেশ থেকে এনে ওর তত্ত্বাবধানে লাগাতাম। পিসীমাই যত নষ্টের মূল। তিনি নিজে সব কিছু থেকে বঞ্চিত। বালবিধবা নিঃসন্তান। অল্পবয়সে আমার (বাবার) মা মারা যাবার পর—আমার লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন। গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা পর্যন্ত পিসীমা আমার অভিভাবকের মত ছিলেন। আমার জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছেন। তাঁর প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমার ছেলেটির কানে বিষ ঢেলে তিনি আমাদের যে সর্বনাশ করেছেন তার জন্যে আমি তাঁকে আর কোনো দিন ভাল চোখে দেখতে পারব না। তাকে মাসে মাসে যে টাকাটা পাঠাই সেটা পাঠাব, কিন্তু তার সঙ্গে আর কোনো রকম সম্পর্ক রাখব না।

অধ্যাপকমশাই বেশ পড়াশুনো করেছেন। গণিত তাঁর নিজের বিষয়, তার বাইরেও তার যাতায়াত আছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের (?) অনেক পরিভাষা তাঁর জানা। মেপে মেপে, ঠিক শব্দ বাছাই করে থেমে থেমে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত পেশ করলেন। খুব আস্তে কথা বলেন, নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, কদাচ মুখে হাসি ফোটে। বললেন: পিসীমা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমার বাবাকে দায়ী করতেন। আমার বাবা নাকি পিসেমশায়ের চিকিৎসায় সুবন্দোবস্ত করেন নি বলে তার অকালমৃত্যু ঘটেছে। এই অভিযোগ শৈশবে তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি। আমাদের বিয়ের পর কয়েক মাস তিনি

আমাদের সঙ্গে কোলকাতার বাসায় ছিলেন। আমাদের জীবন সেই কয়মাসেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। জানানো উচিত, আমাদের মানে আমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে বিয়ের আগে থেকে পরিচয় ছিল। স্ত্রী আমার থেকে কয়েক বছরের জুনিয়র। ওকে গণিতে 'কোচ' করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের বিয়েতে পিসীমার মত ছিল না। নানা ভাবে আমার স্ত্রীকে তিনি হেয় করার চেষ্টা করতেন। কাজেই তাঁকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। পিসীমার মনে ভালবাসা বলে কিছু নেই, তিনি চান আধিপত্য। আমার ওপর আধিপত্য হারিয়ে অলকের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাকে আমাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছেন। আমাদের জব্দ করা আর অলকের ওপর আধিপত্য করা—দুই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ওকে বুঝিয়েছেন যে আমরা ওকে ভালবাসি না। আমাদের ভালবাসা সবটাই নাকি খুকুর জন্যে তোলা ছিল। অলকের এক মাস বয়সের সময় তাকে পিসীর হাতে তুলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে কলেজ যেতে হত। কারণ চাকরীতে তখন সবে বহাল হয়েছে, ছুটি পাওনা নেই। খুকুর জন্মের পর ও তিন মাস ছুটিতে ছিল। এই ব্যাপারটাকেই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সাত বছরের ছেলেটার কানে তুলে ওর মনে বাপ-মায়ের প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব এনে দিয়েছেন। খুকুর জন্মেব পব পিসীর হাতে তুলে না দিয়ে অলককে তুলে দেওয়াই নাকি আমাদের অলকের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ।

অধ্যাপক তাঁর স্ত্রীকে সামনে রেখে কথাগুলো বললেন। অধ্যাপিকা মাঝে মাঝে শুধু ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালেন। একটি কথা নিজে থেকে বললেন না। স্বামীকে সব বিষয়েই ওকালতনামা লিখে দিয়েছেন মনে হল।

অলককে মুখ খোলাতে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে হল। পরে যখন মুখ খুলল—তখন আর থামতে চাইল না। অনর্গল কথা বলে গেল।

অলক : থামা (ঠাকুরমা) আমাকে বলেছে বলেই কি আমি বদলে গেছি ? বাজে কথা। খুকুকে পেয়ে বাবা-মাই বদলে গেছে, আমাকে চায় না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, থামাও বাসে না। খুকুটা একটু ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসতে চাই। কিন্তু ওরা আমাকে খুকুটার কাছেই ঘেঁষতে ছায় না। ওরা পিসীকে বলে ডাইনি। আমাকে নাকি তুক করেছে।

বললাম : তুমি তো বাবার কাছ থেকে কত জিনিস পেয়েছ, মামণি-ও তো এই সেদিন—তোমার জন্মদিনে ক্রিকেটের ব্যাট উপহার দিলেন। তোমাকে কোলকাতার সেরা স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। অন্য স্কুলের থেকে তিনগুণ খরচা বেশি। তোমার যত বই আছে অত বই তোমার বয়সী কোনো ছেলের নেই। তবে কেন ভাবছ যে বাবা-মা তোমাকে ভালবাসেন না ? ঐ বয়সের ছেলে হলে কি হবে, জবাবে সে বলল : জিনিস দিলেই ভালবাসা হয় না। আমি তো নোংরা ভিখিরীদের জিনিস, পয়সা দিয়ে থাকি। তা বলে কি আমি তাদের ভালবাসি ? দূর থেকে ছুঁড়ে জিনিস পয়সা দিয়েই পালিয়ে যাই। ওদের দেখলে আমার কেমন যেন লাগে। ওদের আমি একটুও ভালবাসি না। ভালবাসলে তো মা-বাবারা আদর করে গাল টিপে দেয়, কতরকম কথা বলে। খুকুকে ওরা ভালবাসে আমাকে বাসে না।

—তুমি যখন ছোট ছিলে তোমাকেও আদর করতেন, গাল টিপতেন, ছড়া শোনাতেন।

—না, আমার একটুও মনে পড়ে না। থামা বলেছে, আমাকে ফেলে রেখে সেজেগুজে মামণি পড়াতে চলে যেত! আমি দুষ্টুমি করব, ওদের বিরক্ত করব। বেশ করব, খুব করব। কিন্তু আমি খুকুকে মারব না—সত্যি বলছি খুকুকে মারব না। ওদের বলে দিন না খুকুর সঙ্গে আমাকে খেলতে দিতে। তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

অধ্যাপক-দম্পতির সঙ্গে পরের দিন কনফারেন্সে বসলাম।

খোলাখুলি বললাম যে তারা অলকের ওপর কিছুটা অবিচার করেছেন। শুধু জিনিস দিলে, অভাব মেটালে, ভাল স্কুলে পড়ালেই হবে না। ছোটদের মুখেও ভালবাসা জানাতে হবে। 'দে ডু নট্ লভ্ হ্যাট্ ডু নট শো দেয়ার লভ্'—শেক্‌সপীয়রের এই উক্তিটি সবার মনে রাখা দরকার।

অধ্যাপকমশাই মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানালেন। 'শো অফ লভ্' তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। এতে ছেলেদের চরিত্র দুর্বল হয়, তারা স্বাবলম্বী হতে শেখে না। আগের দিনের যৌথ পরিবারে ছেলেদের অভাব মিটিয়েই অভিভাবকেরা কর্তব্য পালন করতেন, তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের দেশে দৃঢ়চেতা পুরুষ জন্মেছে। 'আজকের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে' বাচ্চা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, 'শো অফ লভ'-এর আধিক্য ঘটছে—তাই এই জেনারেশনে মানুষের মত মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

—ভালবাসা জানানোতে বাড়াবাড়ির কথা আমি বলছি না। তবে একেবারে নিক্তি মেপে ভালবাসা জানাতেও বলছি না। মেয়েটিকে আপনারা যে-ভাবে ভালবাসা জানাচ্ছেন, ছেলেটিকেও ছোটবেলা থেকে সেই ভালবাসা জানালে পিসীমার কথায় ছেলে বিগড়ে যেত না, বোনকে হিংসে করত না। আপনাদের শীতল ভালবাসা যতই আন্তরিক ও গভীর হোক না কেন, অলকের মনে তার সাড়া জাগছে না।

মেয়ে ও ছেলেকে একইভাবে মানুষ করা ঠিক ? মেয়েকে একদিন পরের বাড়ী পাঠাতেই হবে, চিরকাল কাছে রাখা যাবে না।

অধ্যাপক-পত্নী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করলেন।—তাছাড়া, ছেলেরা বড় হয়ে সমাজ পরিচালনার ভূমিকা নেবে, মেয়েরা তা নেবে না। ছেলেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যে দৃঢ়তা অবলম্বন দরকার, মেয়েদের বেলায় সেটার প্রয়োজন নেই।

বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না।—বলেন কি ? মেয়েদের

সমাজ পরিচালনায় কোনো ভূমিকা নেই ? আপনি কি বলেন মিসেস লাহিড়ী ?

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। স্বামী বললেন : ভূমিকা নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু সমাজে তাদের ভূমিকা হবে গৌণ, পরিবার পরিচালনায় তাদের ভূমিকা হবে মুখ্য। সেখানে পুরুষালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দরকার হবে না।

—কিন্তু মিঃ লাহিড়ী, আপনিতো নিজস্ব পদ্ধতিতে ছেলেকে মানুষ করেছেন। ফল দেখে কি আপনার মনে হয় নি যে আপনার পদ্ধতি সঠিক নাও হতে পারে।

—কোথায় একটা গলদ আছে নিশ্চয়ই, তাইতো আপনার সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পিসীমাই যত নষ্টের গোড়া—'ভিলেইন অফ্ দি পিস'।

লাহিড়ী-দম্পতি অবশ্য আর আসেন নি। একদিন মিসেস লাহিড়ী ফোনে একটু ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে তিনি একবার একা আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর নিজস্ব কিছু বলবার আছে। ঐ পর্যন্ত। তিনি এখনও দেখা করার সময় পান নি।

এইবার অধ্যাপক-দম্পতির ভালবাসা সম্পর্কে ধারণা ও শিশু-পালন পদ্ধতি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা চলে।

আমার মনে হয় অধ্যাপক লাহিড়ী তাঁর পিসীমার মতই (অবশ্য পিসীমা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি সব তার মুখে) আধিপত্য প্রয়াসী ও কর্তৃত্বাভিলাসী। সামন্ততান্ত্রিক কালের পিতাই তাঁর আদর্শ। পিতার সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেন তিনি, তাঁর মুখেই শুনেছি। ঠিক আত্মকেন্দ্রিক নন, তবে অহম্মন্যতায় ভরপুর। বাইরে খুব মৃদু, ভেতরে খুব কঠিন। নিজের ও পুত্রের 'কেরিয়ার' তৈরীর দিকে তাঁর যত কিছু আগ্রহ। তিনি ভালবাসা চান না, আনুগত্য পেলেই খুশি। স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। তাঁর ছকে বাঁধা পথে চলতে না পারলে, তিনি কাউকেই ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীটি সুন্দরী ও

ভালমানুষ। শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী তার সম্মানবৃদ্ধি করেছে, বিবাহও তিনি ঐ কারণেই করেছেন। স্ত্রী স্বামীকে যতটা ভয়ভক্তি করেন, ততটা ভালবাসেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্যই স্বামীর সামনে আমাকে বলতে সাহস পান নি। বাইরে থেকে মনে হতে পারে এঁরা আদর্শ দম্পতি, কিন্তু আমার বিশ্বাস অধ্যাপিকা লাহিড়ী সুখী নন।

লাহিড়ীর উদ্ভট মতামত ও ছেলে মানুষ করার পদ্ধতিই এই অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী।
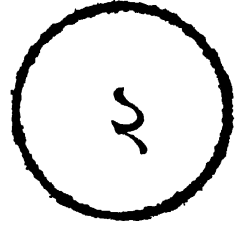
কাব্য-নাটক-ইতিহাসে মনের রোগের কাহিনী অনেক পড়েছেন, অনেক শুনেছেন। ঈডিপাস রেকস ও ইলেকট্রা অস্বাভাবিক অজাচার প্রবণতার চিত্র দেখে হয়তো চমকে উঠেছেন। অরেস্টেসে নাটকে পাপবোধ ও অনুতাপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে অলীক দর্শন ও অলীক শ্রবণের যে নাটকীয় বর্ণনা আছে, তা পড়ে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। ঈর্ষাপরায়ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ওথেলোর পরিণতি আপনাদের ব্যথিত করেছে, লেডি ম্যাকবেথের স্বপ্নাচারিতা বাধ্যতামূলক হাত ধোয়ার দৃশ্যে হয়তো বা মহিলাটির জন্যে মনের কোণে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও করুণার উদ্রেক হয়েছে। অতিবড় সনাতনপন্থীও শৈবলিনী ও কিরণময়ীর উন্মত্ততা দেখে অন্তত সাময়িকভাবে এই দুই নারীর জন্যে সহানুভূতি বোধ করেছেন। এই সব মানসিক অসুস্থতার কাহিনী আপনাদের অভিভূত করলেও আপনারা এগুলোকে নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই নিয়েছেন। বাস্তব জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনেকেরই হয়তো মনে হয় নি। পাগলাগারদের অধিবাসীদের জীবনকাহিনী শোনবার প্রয়োজন বা সুযোগ যাঁদের

ঘটেছে তাঁরা জানেন জীবনে অনেক সময় নাটকের থেকেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে থাকে। তারই একটি আজ আপনাদের শোনাবো।

তার আগে পুরান ইতিহাসের পাতা থেকে দু'চারজন নামকরা কীর্তিমান পুরুষের অসুস্থতার কথা শোনানো, বোধ হয় খুব অস্বাভাবিক হবে না। গ্রীক-বীর হারকিউলেসের মৃগী রোগ ছিল। রোগের আক্রমণের সময় তিনি পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত মারমুখী উন্মাদের মত আচরণ করতেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিজের ছেলে, ভাইপো, বন্ধু ও শিক্ষককে নিহত করেন। অ্যাজাকস্ উন্মত্ত অবস্থায় শত্রু মনে করে একপাল ভেড়ার গর্দান নেবার পর আত্মসচেতন হয়ে অনুতাপে আত্মহত্যা করেন। ভারতের পৌরাণিক রাজা কল্মাষপদের মানুষ খাবার কাহিনী আর ব্যাবিলনের রাজা নেবাচাঁদনেজার-এর নিজেকে নেকড়ে মনে করার কাহিনী নিঃসন্দেহে অসুস্থ মনের কাহিনী। সক্রেটিস, ডেমক্রিটাস, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—তিন-জনেই মানসিক রোগে ভুগেছেন। তৈমুরলং মড়ার খুলি দিয়ে পিরামিড তৈরী করতে ভালবাসতেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো শেষ জীবনে সন্দেহবাতিকে ভুগেছিলেন। তিনি মনে করতেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে একবার লণ্ডনের এক হোটেলে মালপত্র রেখে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস না হয়, জেমস সি কোলম্যানের লেখা অ্যাবনরমাল সাইকোলজি অ্যাণ্ড মডার্ণ লাইভ (ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭২) পড়ে দেখতে পারেন। বেটোফেন, মোজার্ট, শুমান—কেউই মনের দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না। বেটোফেন ও মোজার্ট দু'জনেই সন্দেহবাতিকের লোক ছিলেন। শুমান স্বর্গীয় আত্মার সঙ্গীত শুনতেন। বারবনিতার জন্যে নিজের কান কেটে তিনি কার যাত্রা ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন জানা নেই, তবে এটা যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ সেটা সবাই জানেন। শোপেনহাওয়ার, জন স্টুয়ার্ট মিল মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা (ডিপ্রেসন) রোগে ভুগতেন। বার্ণস ও

বায়রন অতিমাত্রায় সুরাসক্ত ছিলেন। কোলরিজ-এর 'কুবলা খাঁ' সৃষ্টির মূলে যে অহিফেন – একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এই সব খ্যাতনামাদের অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের এই রহস্যের খবর জানেন। আমি চরিত্র হননের জন্যে এঁদের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করছি না। অথবা আমি এই সব উদাহরণ পেশ করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে চাই না যে প্রতিভা ও উন্মত্ততা এক। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে বাস্তব জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় হতে পারে। আরো একটি বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। (মনের অসুখ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। মনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সব সময়ই দুর্বল বা হীন নয়, অনেক বড় বড় সাধু-সন্তরাও মনের রোগে ভুগেছেন জানলে মনের অসুখকে আর মানুষ বিধাতার অভিশাপ বা শয়তানের অনুগ্রহ বলে মনে করবে না, মনের অসুখ সারাতে ভূতের রোজা ডাকবে না।)

আমার কাহিনীর নায়ক তিরিশ বছরের দোহারা চেহারার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে তিনি আমার এক পরিচিত ডাক্তারের চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসেন। মনে করা যাক, তার নাম প্রসূন রায়। প্রসূনবাবু একটা বড় ফার্মে ভাল মাইনের চাকরী করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। থাকেন উত্তর কোলকাতার কোনো এক পল্লীতে। স্ত্রী আর পাঁচ বছরের শিশুসন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক আগে। প্রসূনবাবু তখন এম. এস. সি পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছেন। বাবা-মা আছেন শিলিগুড়িতে। তাঁর বড় দুই ভাই বিদেশে চাকরী করেন। এ-কাহিনীতে তাঁদের ভূমিকা বিশেষ কিছু নেই। প্রসূনবাবুর শারীরিক কোনো রোগ নেই। বছর দুয়েক ধরে তিনি এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। ট্রেনে চাপতে তাঁর ভয় হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনে করে কোথাও যেতে হবে শুনলে তিনি আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠছেন।

তাঁর চাকরীতে প্রায়ই দিল্লী, বোম্বাই যেতে হয়। সেই সময় ছোট শ্যালককে বাসায় রেখে তিনি বাইরে যান। পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত ২০।২৫ বার তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে। প্রথম ক'বছর কোনো অসুবিধা ছিল না। তিনি বাইরে যেতে বরং আনন্দই পেতেন। টি-এ ইত্যাদি বাবদ এতে আইনসঙ্গত বেশ কিছু টাকা উপরি রোজগারও হত। কিন্তু বছর দুয়েক আগে প্রথমে তিনি রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠে এই আতঙ্কের আভাস পান। গাড়ী হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগে তাঁর মনে হয় বুকের বাঁ দিকটায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপ্‌সা দেখছেন, গা ঘামছে, বমন উদ্রেক হচ্ছে। তিনি ভয় পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে সোজা বাড়ী চলে আসেন। সেই রাতেই পাড়ার ডাক্তার এবং পরের দিন অফিসের ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ নেওয়া হল, বুকের এক্‌স্‌রে ফোটো তোলা হল। কোনো রোগের হদিশ পাওয়া গেল না। ডাক্তারেরা বললেন পেটে বায়ু জমার দরুনই বোধ হয় এই রকম হয়ে থাকবে। দু-দিন বাদে তিনি অফিসে যাতায়াত সুরু করলেন। মাসখানেক বাদে তাঁর অফিস নির্দেশ দিল আবার বাইরে যেতে হবে। এবার বোম্বে। যথারীতি টিকিট কাটা, রিজার্ভেশন পর্ব চুকে গেল। নির্ধারিত তারিখের দিন তিনেক আগে যাবার কথা ভাবতেই তিনি আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আবার ডাক্তারী পরীক্ষা। এবারও সেই একই রায় দিলেন চিকিৎসকেরা। কোনো রোগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কুলাইজার খেতে নির্দেশ দিলেন। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে প্রসূনবাবু প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি এই ছেলেমানুষী ভয়কে কিছুতেই আমল দেবেন না। প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় উঠে বসার আগেই তিনি স্টেশনের খাবার ঘরে চা খেতে খেতে অসুস্থ বোধ করলেন। সেই বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরা, পেট ঘুলিয়ে উঠলো, যা খেয়েছিলেন সব বমি করে দিলেন। স্ত্রী, শ্যালক এবং অফিসের এক বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন।

বন্ধুটি দেখলেন, নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত। এবারও অফিসের গাড়ী করে বাড়ী ফিরতে হল। এর পর এক নামী নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে সাত দিন রইলেন। নানা ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েও কোনো শারীরিক রোগের সন্ধান মিলল না। অফিসের কর্তারা তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। অন্য বিভাগে তাঁকে বদলি করা হল, বাইরে যাওয়ার দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। ট্রেনে ওঠার ভয় কিন্তু তার রয়েই গেছে। তিনি এই ভয় থেকে মুক্ত হতে চান।

—জানেন ডাক্তারবাবু, শুধু লেখাপড়া নয়. খেলাধূলাতেও আমার স্থান বরাবর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উঁচু সারিতে ছিল। ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। এই নিউরোটিক দুর্বলতার দরুন আমার প্রতিপত্তি অনেকটা খর্ব হয়েছে। অফিসে কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউ বা অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে উত্যক্ত করে তোলে। আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন? স্ত্রীর কাছে আমি ছোট হয়ে গেছি, তিনি আমাকে অনুকম্পার চোখে দেখতে সুরু করেছেন। আর ভয় এখন ট্রেনে ওঠাতেই শুধু নয়, বাড়ীর বাইরে যেতেই আমার ভয় হচ্ছে। ভয় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। অফিস থেকে আগে নিয়মিত খেলার মাঠে যেতাম। এখন সে পাট বন্ধ। লাঞ্চের পর থেকেই আমি ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করি। কতক্ষণে পাঁচটা বাজবে, কতক্ষণে গিয়ে গাড়ীতে উঠব—এই চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেশিক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকা বন্ধ করেছি। ক্লাব ছেড়েছি, আড্ডা ছেড়েছি। খালি বাড়ী যাবার চিন্তা। দিনের মধ্যে অফিস থেকে অন্তত পাঁচবার নানা অছিলায় বাড়ীতে ফোন করি। বাড়ী ঢোকবার আগেও বুক দুরদুর করে; কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে স্ত্রীকে ছেলেকে দেখলেই আমার মন শান্ত হয়। এটা কি রোগ? কি জন্যে এমন হচ্ছে?

দু-দিন তিন দিনের মধ্যে আমারই নির্দেশে ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা খুলে বললেন: স্ত্রী আমার আহামরি গোছের না হলেও, দেখতে ভালই। বি-এ পাশ করেছেন বিয়ের পর। আত্মীয়-

স্বজন মহলে খুবই সুনাম। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি কর্মঠ। বিয়ের পর প্রথম বছর তিনেক আমার দুই ভাই-ই কোলকাতায় ছিলেন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। কোনো গোলমাল হয় নি। আমার স্ত্রীকে বড়রা সমীহ করে, বাচ্চারা ভয় পায়। রাশভারী এক ধরনের মানুষ থাকে জানেনতো, যারা অনায়াসে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করে যায়, আমার স্ত্রী সেই জাতের। সব ব্যাপারে তাঁর জেদই বজায় থাকে। তাঁর অনেক অন্যায় সিদ্ধান্তও আমাকে মেনে নিতে হয়। দু-একবার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে। না আমরা প্রেম করে বিয়ে করি নি। তবে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের জানাশোনা অনেক দিনের। আমি বিদ্রোহ করলে তিনি ঝগড়াঝাটির মধ্যে যান না। উঁচুগলায় কথা বলতেও তাঁকে খুব কম শোনা যায়। তবে কি করে বুঝি তিনি রাগ করেছেন? কথা বন্ধ করেন; স্রেফ বোবা হয়ে যান। অবশ্য শুধু আমার সঙ্গে কথা বলেন না। অন্যের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমার সুখসুবিধা খাওয়াদাওয়া, পোষাক-আসাকের তদ্বির-তদারক যথারীতি আগের মত করে যান। ঝি-চাকরেরা বুঝতে পারে না যে আমাদের মধ্যে নীরব সংগ্রাম চলেছে। আমি বড় জোর এক সপ্তাহের মত এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর চাপ সহ্য করতে পারি। সহ্য করতে পারি মানে এই নয় যে আমি বেশ নিশ্চিত থাকি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি, দিনরাত আমাকে পীড়িত করে। তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে নিরুদ্বেগে ঘুমুতে থাকেন আর আমি ঘুমের বড়ি খেয়েও ছটপট করি। তারপর একদিন নতি স্বীকার করি। স্নায়ুর চাপ কমে, অনেকটা শান্তি আসে। কিন্তু নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই, পরাজয়ের গ্লানি কাটতে চায় না। ভেতর থেকে কে যেন আমাকে চাবুক মারতে থাকে। আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এবার কোনো সংঘর্ষ ঘটলে আমি নতি স্বীকার

করব না। সংঘর্ষ ঘটে, বিদ্রোহ করি, আবার পরাজয় স্বীকার করি আর যন্ত্রণায় ভুগি।

রাজধানী এক্সপ্রেসে সেদিন প্রথম আতঙ্কের আভাষ পেয়েছিলেন সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন ছিল মনে আছে কি? যুদ্ধপর্ব না শান্তি পর্ব? কোন পর্ব চলছিল?

—বেশ মনে আছে। একটু বড় দরের অশান্তিই ঘটেছিল। ছেলেকে নিয়ে। উনি ছেলেকে কিছুতেই স্কুলে পাঠাতে চান না। আমি একটা বেবি স্কুলে ধরপাকড় করে ওকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলাম; উনি ছেলেকে কিছুতেই ছাড়বেন না। জানেন তো আজকাল কিণ্ডার-গার্টেন থেকে স্কুলে না ঢুকলে পরে আর জায়গা পাওয়া যায় না। উনি কিছুতেই আমার কথা বুঝতে চাইলেন না। তর্ক করা ওর সঙ্গে বৃথা। কানে উনি সুবিধামত তুলো গুজে দিতে পারেন। তাই করলেন আর মুখেও ছিপি আঁটলেন। স্টেশনে যাবার আগে জোর গলায় ঘোষণা করলাম যে দিল্লী থেকে ফিরে এসেই খোকাকে স্কুলে পাঠাবো। দেখি কে বাঁধা দিতে আসে।

—আপনার মনে গাড়ীতে ওঠার আগে থেকেই তাহলে অশান্তি উদ্বেগ ছিল!

আমার কথার উত্তরে তিনি বললেন—বেশি পরিমাণেই ছিল।

—শুধু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাই বললেন; এবার ভাল কথা কিছু শোনান।

—ভাল কথা মানে ভালবাসার কথা? স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? মনে হয় অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হতে পারতাম। এই আতঙ্ক-রোগের জন্যে চিকিৎসা করতে হত না। নিউরোসিসের জন্যে লোকের কাছে হেয় হতাম না। কিন্তু আমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে বাইরেও প্রেম করে বেড়ায়। আমাকে দু-একবার সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

আমার রুচিতে বেধেছে। আমি আমন্ত্রণে সাড়া দিই নি। আবার নববিবাহিত বন্ধুদের বিবাহিত জীবনের গল্প শুনলে মনে হয় আমি স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই পাই নি ; উনি আমাকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

—আপনি দিনে পাঁচবার করে বাড়ীতে ফোন করেন কেন? বাড়ী থেকে বাইরে থাকতে চান না কেন? আপনি কি স্ত্রীকে সন্দেহ করেন?

প্রসূনবাবু যেন ঈষৎ চমকে উঠলেন। পাশের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে চলেন: আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কূলকিনারা পাচ্ছি না। আমাকে তিনি যত্ন করেন আমার সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি আছে। কিন্তু স্ত্রীর সব কর্তব্য তিনি পালন করতে চান না। ভবেশ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ কি ঘটে না ঘটে—তার আনুপূর্বিক বিবরণ সে আমাকে দিত। প্রায় এক সময়েই দু-জনের বিয়ে হয়েছে। তার কথা শুনে বুঝতাম আমার স্ত্রী অন্যদের স্ত্রীর মত নন. গোড়ার দিকে এ নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু এখন করি না। ভবেশকেও যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি। ওর মিলনের গল্পগুলো শুনে আমার রক্তে আগুন জ্বলে ওঠে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

একটু থেমে এবার একটু উঁচুগলায় বলে উঠলেন: আমার মধ্যে প্যাশান খুব বেশি। আমার স্ত্রী শীতল তার মধ্যে উত্তাপ কম। প্রথম দিকে মনে হত আমি বোধহয় অ্যাবনরম্যাল, তিনিই নরম্যাল। কিন্তু ভবেশ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনে আমার ধারণা পালটে গেছে।

—আপনি দাবী করেন না কেন।

—দু'একদিন যে করি নি এমন নয়। বিশেষ করে যে রাত্রে পার্টি বা ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ সুরা পান করে বাড়ী ফিরেছি সেই রাত্রে দাবী করেছি, জবরদস্তিও করেছি মাঝে মাঝে। তখনকার মত তৃপ্তিও

হয়তো পেয়েছি। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই মনে পড়েছে স্ত্রীর ছোট্ট দুটি কথা—ছিঃ! তুমি বড় গ্রোস, বড় ভালগার। লজ্জায় মুখ তুলে সেদিন স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারিনি। আরো লজ্জিত হয়েছি যখন বুঝতে পেরেছি অহল্যা যে পাষাণ সেই পাষাণই রয়ে গেছেন।....

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলাটা ধরে এল। তিনি ধীরে ধীরে মুখ নীচু করলেন।

—আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না কিন্তু।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে প্রসূনবাবু বললেন : ঐ প্রশ্নের জবাবটা আমি আপনার কাছে পাব আশা করছি। আমি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি কি? আমি ঠিক বুঝতে পারি না? স্ত্রী আমাকে ভালবাসেন কিনা তাও আমি বুঝতে পারি না। কেননা অন্য কোনো নারীর ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ব্যাপারটা কি আমি হয়তো ঠিক জানি না। তবে তিনি যে আমাকে শ্রদ্ধা করেন না—এ আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি। আর ঐ জায়গাতেই আমার দুর্বলতা। মনে হয় ভালবাসা না পেয়েও বাঁচা যায়, দৈহিক মিলনের আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়াই দিন কাটানো যায়। কিন্তু একই ছাদের তলায় আমার দিনরাতের সঙ্গী আমাকে সমীহ করবে না, আমার বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করবে না—এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। ছোটবেলা থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে শুধু বাহবা পেয়ে এসেছি। ইউনিভারসিটির সব পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। অফিসে অল্পদিনের মধ্যে জবরদস্ত ডিরেকটররা আমার মূল্য বুঝেছে, সেই অনুযায়ী দক্ষিণা ও মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার কদর বুঝলেন না, আমার প্রাপ্য আমি পেলাম না। তাই আমার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত, আমার অহংবোধ বিপর্যস্ত। আমি অসুখী। আপনি এবার বলুন, আমি ওকে সন্দেহ করি কি করি না? না। ও প্রশ্নের জবাব আমার দরকার নেই। আপনি আমার 'আতঙ্করোগ' দূর করতে সাহায্য করুন। স্ত্রীকে ছাড়া যাতে

—৩

আমি চলতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিন। ওঁর ওপর আমার কেন এই অস্বাভাবিক নির্ভরতা? আমার রোজগারে সংসার চলে, ওঁর নিত্যপ্রয়োজনের সব জিনিস আমি জোগাই। উনি আমার ওপর নির্ভর করবেন—এইটেই তো স্বাভাবিক। উল্টোটা কেন হল? আমার ভয় কিসে যাবে বলুন।

—সন্দেহ অবিশ্বাস কাটলেই ভয় চলে যাবে।

—সন্দেহ যে মাঝে মাঝে হয় না, তা নয়। কিন্তু আবার মনে হয় ঐসব মেয়েরা ভালবাসতে জানে না, ভালবাসা পাবারও ওদের দরকার হয় না। দেহমন দু-দিক থেকেই আমার স্ত্রী-র শীতল বরফের মত ঠাণ্ডা। পরপুরুষের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ওঁর মনে জাগতেই পারে না। আবার এও মনে হয় যে হয়তো এই উষ্ণতার অভাব শুধু আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আমি আপনাদের কিছু লিটারেচার পড়েছি। 'ইমপোটেন্স ও ফ্রিজিডিটি' দুইই নাকি স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ। ঠিক জানি না। আপনি বলছেন সন্দেহর জন্যই আমি বাইরে থাকতে ভয় পাই। ঘন ঘন ফোন করে দেখি স্ত্রী ঘরে আছেন কিনা। তাই যদি সত্যি হয় তবে আমার মত হীনপ্রকৃতির মানুষ খুব কমই আছে বলতে হবে। আমার সন্দেহ দূর হবার কি কোনো উপায় নেই।

—বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রসূনবাবু।

বললাম: অনেক মেয়েই যৌনশীতল। তা বলে তারা স্বামীকে ভালবাসে না—একথা ঠিক নয়। মর্যাদার লড়াই আপনাদের দাম্পত্যজীবনকে অসুখী করেছে। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন নাই বা হলেন প্রসূনবাবু। স্ত্রীকে নিজের সমকক্ষ বলে ভাবতে শিখুন, পুরুষালী দম্ভ ভুলে যান। তা হলেই দেখবেন সন্দেহ দূর হবে, হয়তো আতঙ্করোগও সেরে যাবে।
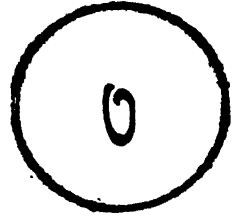
অপূর্ববাবু আর তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলির বিবাহিত জীবনের ইতিহাস শুনতে শুনতে ঐ লাইন কটা মনে পড়ছিল।

প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের এক মাঝারি গোছের কয়লাখনির ম্যানেজার অপূর্ব সান্যাল তাঁর কোলিয়ারীর ডাক্তারের পরামর্শে স্ত্রীকে কোলকাতায় এনেছেন চিকিৎসার জন্যে। বছর কয়েক ধরেই চিকিৎসা চলছে। প্রথমে মনে হয়েছিল জরায়ুঘটিত কোনো রোগ। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা কিছুদিন চিকিৎসার পর মনের রোগের ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে উপদেশ দিয়েছেন। সেই সূত্রে সান্যালের সঙ্গে পরিচয়। পুরনো ব্যবস্থাপত্র, ল্যাবরেটরী রিপোর্ট, এক্স-রে ফোটো ইত্যাদি দেখানোর পর তিনি এই ভাবে স্ত্রীর অসুখের বিবরণ দিলেন ওকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ও যদি বুঝতে পারে আপনি পাগলের ডাক্তার তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমাদের ডাক্তারবাবু মাত্র আভাস দিয়েছিলেন যে ওর শরীর খারাপের কারণ হয়তো মনের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে—তাইতেই ও ডাক্তারবাবুর ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে বার পাঁচ-ছয় কোলকাতায় এনে নানাধরনের অনুসন্ধান চালিয়েও শরীরের

কোনো বড় রকমের ব্যাধির হদিশ মেলেনি। টনসিল অপারেশন, জরায়ু 'কিউরেট' হরমোন চিকিৎসা সব কিছু করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। কুড়ি বছর বিয়ে হয়েছে, ওর বয়স এখন ছত্রিশ আমার বিয়াল্লিশ। এই কুড়ি বছরে পনেরো বছর ধরে ও অসুস্থ। গত তিন-চার বছর ধরে বেশ বাড়াবাড়ি চলেছে। মাঝে মাঝে বেশ ভাল থাকে। ওর কাজকর্ম হাসি-ঠাট্টা গালগল্প দেখে কার সাধ্য বোঝে যে ওর কোনো অসুখ আছে। ঐ রোগা শরীরে আমাদের অত বড় সংসারের সব ঝক্কি বলতে গেলে একলাই সামলাতে পারে। আবার যখন মেজাজ বেগড়াতে শুরু করে তখন ধারণাই করা যায় না যে এই মাত্র সাতদিন আগেও ও বারোজনের খাবার টেবিল ম্যানেজ করেছে, ছেলেমেয়েদের সাজিয়েগুজিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছে সংসারে যার যেটা দরকার সেটা ঠিক সময়মত তার হাতের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমটায় খিটখিটে হয়ে ওঠে। অল্পেতেই রেগে যায়, আমার প্রতিটি কাজে খুঁত ধরে ঝি-চাকরদের বিনা কারণে গালমন্দ দিতে থাকে। তারপর শয্যা গ্রহণ করে। অনেক সাধ্য সাধনা করলে হয়তো দুদিন অন্তর এক বালতি জলে কোনো রকমে মাথাটা ভিজিয়ে স্নান সারে; প্রায় জোর জবরদস্তি করে খাওয়াতে হয়, তাও দিনান্তে হয়তো দুখানা রুটি কি দুহাতা ভাত ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে নামানো যায় না। আমার মশায় মেজাজ এমনিতেই একটু তিরিক্ষে আর এই সব দেখলে আরও তেতে উঠি। হ্যাঁ—তা মাঝে মাঝে চড়টা চাপড়টা যে দিই না এমন নয়। সারাদিন কুলি ঠেঙ্গিয়ে বাবুদের খিঁচিয়ে বাড়ীতে এসে যদি অশান্তি পোহাতে হয় তাহলে কার মেজাজ ঠিক থাকে বলুনতো?

অপূর্ববাবুর পালোয়ানী চেহারা আর মিলিটারী মার্কা গোঁফ দেখে মনে হল তাঁর মেজাজ একটু নয় বেশি রকমেরই তিরিক্ষে এবং তিনি বেশ জবরদস্ত ম্যানেজার। ম্যানেজ করার ব্যাপারে তিনি প্রয়োজন হলে চড়চাপড়ের মত মৃদু পন্থার পরিবর্তে যে কোনো

ধরনের উগ্রপন্থা গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন না। পরে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম আমার অনুমান খুব মিথ্যে নয়।

স্বামী আরও বললেন—ও আগে আমাকে বেশ সমীহ করত, আমার মতামত অগ্রাহ্য করতে সাহস পেত না। কিন্তু আজকাল ও বদলে গেছে। আমার সব কথাই অগ্রাহ্য করে না তবে এই রোগের ব্যাপারে আমার ও ডাক্তারবাবুর মতামত মানতে চায় না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে ও 'ডিপ্রেসনে' ভুগছে। 'ডিপ্রেসন' মানে যে এক ধরনের পাগলামি একথা ও জানে। উল্টে বলে সে আমাদের কোলিয়ারী ডাক্তার ম্যানেজার ওভারশিয়ার সবাই পাগল; তাই ওকে আমরা পাগল মনে করছি।

—আপনাদের মধ্যে কি বিয়ের আগে জানাশোনা আলাপ পরিচয় ছিল ?

—একেবারেই না। আমি মধ্যপ্রদেশের ঐ কয়লাখনির শহরে মানুষ আর ওর জন্ম এখানে এই নৈহাটির-এর কাছে এক গ্রামে। আমরা দুজন একেবারে দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। ওদের পরিবার ন্যায়রত্ন তর্কচঞ্চুর পরিবার—ওর ঠাকুরদাদা বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তার চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশের ছাত্র পড়ত। ওর বাবা অল্প বয়সে মারা যান। মা সেই থেকে সাংসারিক সব ব্যাপারে উদাসীন। পূজো-আচ্চা জপতপ নিয়েই ছিলেন। ওর ঠাকুরদাদা ওকে খনা কিম্বা গার্গীর মত পণ্ডিত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। ও চোদ্দ বছরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁর আশা সফল হয়নি। তবে ওকে তিনি হিন্দুদের নিত্যকর্ম পদ্ধতির জীবন্ত নিদর্শন তৈরী করে গেছেন। বিয়ের আগে ওর সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ পরিচয় ঘটলেও প্রেম হবার সম্ভাবনা ছিল না। ও আমাকে ম্লেচ্ছ মনে করে আমার গায়ের বাতাস পর্যন্ত এড়িয়ে চলত। আমরা আবার ঠিক ওর উল্টো ধরনের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছি। বাবাও কোলিয়ারীতে কাজ করতেন। ছোঁয়াছুঁয়ি খাওয়া-দাওয়ার বাদবিচার আমরা মানতাম

না। যস্মিন দেশে যদাচার—এই নীতি অনুসারে তিনি পানভোজনে খুবই 'লিবারেল' ছিলেন। আমরা যা কাজ করি তাতে একটু আধটু অ্যালকোহল ছাড়া আমাদের সন্ধ্যা কাটানো সম্ভব নয়।

—আপনাদের এই দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দার মিলন ঘটলো কি করে?

যিনি ঘটকালি করেছেন তিনি অঘটন ঘটাতে পারেন মনে হচ্ছে।

—আরে মশাই কোনো ঘটক-ঘটকীর সাধ্য ছিল না এ ব্যাপার ঘটাবার। সে এক গল্পের মত ব্যাপার—শুনলে বিশ্বাস হবে না। এইটুকু জেনে রাখুন জন্মলগ্নে গ্রহের অধিষ্ঠান থেকে মানে ঠিকুজী কোষ্ঠীতে রাজযোটক মিল হওয়াতে বিয়েটা ঘটেছে। মিলটা বোধ হয় অন্য জগতে গিয়ে হবে কিম্বা হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না;—বলে ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

এরপর গীতাঞ্জলিকে দেখলাম ও তাঁর মুখে রোগ ইতিহাস শুনলাম। রোগা পাতলা চেহারা। করুণ বিষণ্ণ হাসি প্রায় সব সময়ে লেগে থাকার দরুণ তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে শুধু হাসলেন কোনো উত্তর দিলেন না। আবার প্রশ্ন করলাম আবার হাসি। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন টুকরো টুকরো কথাগুলো একসঙ্গে জড়ো করে আপনাদের শোনাচ্ছি—কি হয়েছে—সেতো আপনি বলবেন। আপনি ডাক্তার আপনি জানেন কি হয়েছে। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমি কি করে জানব আমার কি হয়েছে? উনি নিশ্চয়ই জানিয়েছেন যে আমি পাগলের ডাক্তার বসাক ওঁর বন্ধু তো তাই বলেন। আপনার কাছে এনেছেন মিথ্যে কথা বলে। আপনি নাকি পেটের ব্যথা সারানোর ডাক্তার। আমি জানি আপনি পাগলের ডাক্তার। ওরা আমাকে পাগল সাজাতে চান। আপনার সার্টিফিকেটে তাই লিখে দিন তা হলেই হবে। মিছিমিছি কতকগুলো বড়ি গেলবার ব্যবস্থা দেবেন না। আমার ওষুধ দেখলেই বমি আসে। অনেক ওষুধ খেয়েছি। পেটের ব্যথা মাথার ব্যথা যেমন ছিল তেমনিই

আছে।··· আপনি তবু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছেন অন্য কেউ শুনতেই চান না। ডাক্তার বসাকের রিপোর্ট পড়ে দু-চারটে মামুলি কথা জিজ্ঞাসা করে গম্ভীর হয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখে উঠে দাঁড়ান।

উনি আপনাকে একতরফা ওর কথা শুনিয়েছেন। আমার কথা আপনি শুনতে রাজী আছেন কি? তা হলে শুনুন। তার আগে বলুনতো পাগল কাকে বলে? আমার সঙ্গে কথা বলে কি মনে হচ্ছে? আমি কি পাগল?

—বললাম অন্যের কথা শুনে অমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। (প্রচলিত রীতি-নীতি নিয়মকানুন মেনে না চললে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যাকে আমরা ঠিক মত বুঝতে পারি না তাকে অনেক সময় পাগল বলি। সাধারণ সংসারী মানুষ আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কেউ সংসারটাকে না দেখলেই আমরা তার আচরণ ব্যবহারে পাগলামির গন্ধ পাই। হিমালয়ের দুদিকে শীতে কৌপীন সম্বল যে সাধু ধ্যানে মগ্ন, নিজের বিষয় সম্পত্তি সর্বস্ব দান করে যে মানুষ ফকির হয়েছে ভেলায় করে যে সমুদ্র পাড়ি দিতে নোঙর তুলেছে—তারা আমাদের অনেকের কাছে পাগল।) আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন। একথা আর কেউ জানবে না।

কথাগুলোতে কাজ হল। গীতাঞ্জলি আমাকে বোধ হয় কিছুটা বিশ্বাস করলেন। দু-তিন দিনের মধ্যে আমাকে অনেক কথা জানালেন। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর মা তাঁকে নিয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েন। টোল উঠে গেল ছাত্ররা চলে গেল ভাগচাষীরা ভাগের ধান দেওয়া বন্ধ করল। ওঁর শ্বশুর আচার-ব্যবহারে ম্লেচ্ছ হলে কি হয় ঠিকুজী কোষ্ঠীতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ওঁদের কয়লাখনির মালিক গীতাঞ্জলির ঠাকুরদাদার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনিই বিয়েটা ঘটান। নামকরা-জ্যোতিষী দিয়ে কোষ্ঠী বিচার করে শ্বশুর ঠাকুর আমাকে দেখলেন। তাঁর পছন্দ হল। মালিকের প্রভাবও নিশ্চয়ই অনেকখানি কাজ করেছিল। মার ঘাড় থেকে বোঝা নামতেই

তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাসী হলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রী আচারনিষ্ঠ গীতাঞ্জলি বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের সব সংস্রব ত্যাগ করে কয়লার ধোঁয়ায় কালো এক শহরের সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এমন এক পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হলেন যাদের চালচলন হাবভাব আচার ব্যবহার একেবারে আলাদা। এদের তিনি বোঝেন না এদের তিনি জানেন না। এদের পুরুষদের গলায় যজ্ঞসূত্র নেই, এদের মেয়েরা বাথরুম থেকে এসে কাপড় কাচে না খেয়ে কাগজে মুখ মুছে শুদ্ধ হয়। খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। পুজাআহ্নিক জপতপের কথা তো ওঠেই না।

গীতাঞ্জলি বললেন—শ্বশুরমশাই রোজ রাতে মদ খেতেন কিন্তু মাতাল হতেন না। তাঁর আচার ব্যবহার যাই হোক না কেন তিনি আমাকে সুনজরে দেখেছিলেন। আমার জন্যে সিঁড়ির ঘরটাকে পরিষ্কার করে ঠাকুরঘর করে দিলেন। স্বামীকে কিন্তু বুঝতে পারতাম না। ভক্তি করার জন্যে ভালবাসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। ঠাকুরের কাছে রোজ প্রার্থনা জানাতাম হে ঠাকুর আমাকে বদলে দাও। আমাকে ওঁদের মত কর কিম্বা ওঁকে আমার মত কর। ঠাকুর আমার কথায় কান দিতেন না। স্বামী চাকরী পেলেন। মদ একটু আধটু গোপনে খেতেন এখন আর গোপন রাখার চেষ্টা করলেন না। তাঁর সঙ্গে প্রথম বছর তিনেক আমার শুধু একটা সম্পর্কই ছিল। রাত্রে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া ছাড়া আমাদের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। তা বলে আমাকে তিনি তাচ্ছিল্য করতেন না। ভালবাসতেন কিনা বলতে পারব না তবে যত্ন করতেন। না চাইতেই এটা ওটা কিনে এনে দিতেন। আতর গয়না ব্লাউজ এই সব। সেগুলো আমার কোনো কাজে লাগত না। বিয়ের বছর তিনেক বাদে কয়েক মাসের মধ্যেই শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই স্বর্গে গেলেন। দেওর-ননদ ঝি-চাকর দিয়ে দশ বারোটি মানুষের সংসারের ভার আমার ওপর পড়ল। আমার সঙ্গে স্বামীর অন্য সম্পর্ক গড়ে

উঠতে লাগল। আমি এখন শুধু শয্যাসঙ্গিনী নয়, গৃহিণী, পরিবারের কর্ত্রী। এই সময় থেকেই দুজনের মধ্যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি আরম্ভ হল। এই সময় থেকেই মাথার যন্ত্রণার সূত্রপাত। কি বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ রাতের দাবী মেটাতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। না, অনিচ্ছা খুব ছিল না; তবে সামর্থ্য কম ছিল, সারা দিন খাটাখাটনির পর দেহটাকে আর টানতে পারতাম না। ও ব্যপারটা তো স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য, শাস্ত্রে তো তাই বলে, কাজেই আমি ও ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা কোনদিনই করিনি।

না, এদিক দিয়ে জোবরদস্তি তিনি কোনোদিনই করেন নি, বরং আমার শরীর খাবাপ বুঝলে নিজে থেকেই রেহাই দিতেন। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুলী-কামিন বা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে তার কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই। ওদিক দিয়ে আমার কোন দুঃখ বা নালিশ নেই। খিটিমিটি তবে কি নিয়ে হত? বলছি। মাঝে মাঝে আমার মধ্যেকার টোলে পড়া আচারনিষ্ঠ, শুচিশুভ্র সত্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমি যেন কি রকম হয়ে যেতাম। অন্যদিনের মত তিনি হয়তো বাইরের কাপড়জামা পরে ঘরে ঢুকে আমার হাত ধরলেন, অমনি আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় কুঁচকে গেল। চোখমুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারতাম, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারতাম না। আমি হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করতাম, উনি বাধা দিতেন আমি সে বাধা না মানলেই তুমুল কাণ্ড ঘটত। আমার স্বামী খুবই বদরাগী। এই সময় রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আমার গায়ে হাত তুলতেন। না, শুধু চড়চাপড় নয় প্রহারের মাত্রা বেশ গুরুতরই হত। একদিন তো বুট দিয়ে পেটে লাথি মেরেছিলেন, সেই থেকে পেটে যে ব্যথা সে ব্যথা আজও সারল না। পতিনিন্দার পাপে হয়তো আমাকে নরকে যেতে হবে, কিন্তু আজ আমি মনের কথা না বলে পারছি না। আর কারুর কাছে এসব বলতে পারিনি। আপনার মত এত মন দিয়ে কেউ আমার কথা

শোনে নি। পাগলের প্রলাপে কে কান দিতে চায় বলুন? তবে ওঁর রাগ খড়ের আগুনের মত। দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। আমার কাছ থেকে কোন বাধা পেতেন না বলেই বোধ হয় দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ওঁর হাত-পা চালানো বন্ধ হয়ে যেত। একদিন লাথি খেয়ে দোতলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পাখার সঙ্গে কাপড় ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে গিছলাম। দরোজায় দুমদাম শব্দ আর ছোট ছেলের কান্না শুনে থেমে যাই। আর একদিন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ঘরের বাইরে পড়ি। সেদিন রাতে স্বামী ঘুমিয়েছেন মনে করে নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলে আলসের ওপর উঠে ঝাঁপ দিতে যাব এমনি সময় পেছন থেকে স্বামী জাপটে ধরে নামিয়ে আনেন। প্রতিবারই মারধরের পর উনি কান্নাকাটি করেন, হাত জোড় করে মাপ চান, আর কখনও এরকম করবেন না বলে পিতা-মাতার নাম নিয়ে শপথ করেন। তখন আমিও গলে যাই, ওঁর কথা বিশ্বাস করি। মাসখানেক যেতে না যেতেই আবার নিজমূর্তি ধারণ করেন। এখন আমি ওঁর কোনো কথাই বিশ্বাস করি না, উনি আমার কাছে ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন।

....আমিও ক্রমশ বদলে যেতে লাগলাম। দু-তিন মাস অন্তর ঠাকুরদার গীতাঞ্জলি আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। ছিঃ ছিঃ একি জীবন আমি যাপন করছি। এ ঘরবাড়ী নরককুণ্ড, এখানে আমার স্থান হতে পারে না। ছেলে-মেয়েকে নিজের মনে হয় না। সেই সময় খিদে চলে যায়, ঘুম চলে যায়, কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না, খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। স্বামীকে আমি এমনিতে বেশ ভয় পাই। কিন্তু সেই সময় ভয়ডর থাকে না, স্বামীর তর্জন-গর্জন কানে ঢোকে না, শুধু ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। দু-একদিন বেরিয়েও পড়েছি, রাস্তা থেকে লোকজন ধরে বেঁধে ফিরিয়ে এনেছে। আচারনিষ্ঠ শুচিশুভ্র টোলে পড়া মেয়েটাই আমি না এই বাড়ীর গৃহিণী, পাঁচটি সন্তানের জননী, ম্যানেজারবাবুর ঘরণী, স্বামীপুত্রের

অশুচি অনাচারের অংশীদার মেয়েটি আমি ? আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমার যেন সে সময় নবজন্ম হয়। ফিরে যাই সেই আমজাম জামরুল গাছে ঘেরা চতুষ্পাঠীর আঙ্গিনায়। এদের আমি তখন চিনতে পারি না। এদের সঙ্গে পীড়িত করে, এদের কথাবার্তা আদর-যত্ন আমাকে কুপিত করে। বছরে দু-তিনবার এই রকম হয়। ওঁদের ম্লেচ্ছাচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। বিদ্রোহ করার ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। এই অবস্থাকে ওঁরা বলেন পাগলামি। ওঁদের বন্ধুডাক্তাররা বলেন ডিপ্রেসন'। এযে কোন রোগ নয়, ওদের আমি বোঝাতে পারি না। ওরা বোঝে না যে ওরাই পাগল। ওঁদের পাগলাগারদে থেকেও আমি মাঝে মাঝে সুস্থ হবার চেষ্টা করি, উন্মাদাশ্রমের নিয়মকানুন মানতে চাই না— তাই ওরা আমাকে পাগল বলে। আপনিই বলুন কে পাগল ? আমি না ওরা ?

কথা শেষ করে মেয়েটি আবার হাসলেন।

অনেক 'প্যারানয়েড' অনেক ডিলিউশনগ্রস্ত (ভ্রান্তিরোগাক্রান্ত) রোগী ডাক্তারদের কাছে এই ধরনের বলে থাকেন। তবে তাঁদের বলার ভঙ্গীর মধ্যে ও বক্তব্যের মধ্যে সংহতির অভাব থেকে যায়। খুব জোরগলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা বলেন যে, আত্মীয়স্বজন তাঁকে পাগল সাজিয়ে উন্মাদাগারে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করেছে। গীতাঞ্জলির কথার ভঙ্গি একটু স্বতন্ত্র। কিছুদিন আগে আমেরিকা-ইয়োরোপের খুব নামকরা কয়েকজন মনোরোগ চিকিৎসক ও দার্শনিক মিলে এক সেমিনারে এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন। এই ব্যক্তিসর্বস্ববাদ সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ মূল্যবোধ যারা মেনে নিতে পারে না, তারা উন্মাদ ? না যারা কোন মতে টিঁকে থাকার জন্যে অর্থপ্রতিষ্ঠার জন্যে আপোষ করে স্থিতাবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে—তারা উন্মাদ ? এই কূট প্রশ্নের আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকুক।

এরপর কয়েক দিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার ফলে এঁদের

পারিবারিক সংবাদ আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম। সান্যাল সাহেব বাইরে যতই সুদক্ষ, জবরদস্ত পরিচালক এবং প্রশাসকই হোক না কেন—নিজের পুত্র-কন্যাদের বেলায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বড়টি ছাড়া আর সব কটিই উচ্ছৃংখল ও উন্মার্গগামী তাঁর মতে স্ত্রীর পাগলামি এর জন্য দায়ী। স্ত্রীর ধারণা বাপ-মায়ের পাপের ফলে সন্তানদের চরিত্র বিকৃতি ঘটেছে। সান্যাল সাহেব মনে করেন বড় হলে অজয়ের (জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম) মত তারা নিজেদের সামলে নিতে পারবে ; কিন্তু স্ত্রী মনে করেন যে বাড়ীতে ধর্মাচরণ নেই, দেবতার স্থান নেই, যে সমাজে মূল্যবোধ বিকৃত—সেই বাড়ীর সেই সমাজের ছেলের মনে কোন দিন শুভবুদ্ধির উদয় হতে পারে না। ছেলেরা বাবা-মার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে না। বাবার মতে এটা প্রজন্ম-ব্যবধান এবং স্বাভাবিক। আর মা মনে করেন, তাঁরা ভালবাসতে পারেন না, কাজেই ভালবাসতে শেখেনি, শিখবেও না।

সান্যাল সাহেব মোটামুটি বুদ্ধিমান এবং বিবেচক। আমি তাঁকে আলাদা করে স্ত্রীর রাগের ব্যাপার বুঝিয়ে বললাম। উনি নিজের মেজাজ গরমের জন্য একটু লজ্জিত। এর জন্য ওঁরও চিকিৎসার দরকার শুনে একটু ক্ষুন্ন হলেন। কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী না হলে স্ত্রী ওষুধ খাবেন না, চিকিৎসা করাবেন না জেনে অগত্যা চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন।

নিজেকে ভাল না বেসে কি অন্যকে ভালবাসা যায়? নিজেকে ভালবাসা কি স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতা? কোন ভালবাসা স্বার্থপরতা নয়? সদাশয়তা পরার্থিতা নিঃস্বার্থপরতা—এই সব গালভরা নাম শুনতেও বেশ, বলতেও বেশ। কিন্তু আসলে এ সব কথার জাদু শুধু নিজেকে আর অন্যকে মোহিত করার মন্ত্র। আমরা যা কিছু করি সবই আত্মতৃপ্তির তাগিদে। বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, নিজেকে ঐ বন্ধুর চেয়ে অন্যের চেয়ে উঁচু দরের জীব মনে করি। এর মধ্যে আত্মপ্রেম, স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি আছে বলতে পারেন? কোনো মিশনের মহারাজকে আপনি যখন মোটা অঙ্কের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আপনি তখনই অনেকখানি সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হলেন। পরার্থিতা ইংরিজিতে যাকে অলট্রাইজম বলা হয়, আসলে অহম্মন্যতার ছদ্মবেশ নয় কি? মা সন্তানকে ভালবাসে নিজের তাগিদে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আপনি সামাজিক হিতের জন্য টাকা খরচ করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেন কেন? পরিবর্তে নিরাপত্তা চান, যশ চান—তাই নয় কি? শিল্পপতি মন্দির, ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্যে লক্ষ

লক্ষ টাকা খরচ করে আত্মবিজ্ঞপ্তির জন্য। বিজ্ঞাপনে লক্ষ টাকা খরচ করে কোটি টাকা রোজগার করার জন্য। আবার দুর্বল মানুষ অন্যকে ভালবাসে বা ভালবাসার ভান করে তার কাছ থেকে ভালবাসা বা বিপদেআপদে সাহায্য পাবার আশায়। তাই নয় কি?....

এইভাবে একটানা খানিকক্ষণ বকে যাবার পর চন্দ্রকান্তবাবু একটু চুপ করলেন। সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন এবার চোখ নীচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের গেলাস থেকে এক ঢোক জল পান করলেন। কিছুদিন আগে চন্দ্রকান্তবাবুর এক বন্ধু ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসেন, এক বিশেষ সমস্যা সমাধানে আমার সাহায্যের জন্য। সমস্যাটা প্রথমত চাকরী নিয়ে, দ্বিতীয়ত স্ত্রীকে নিয়ে। বছর পাঁচেক আগে নমিতার সঙ্গে আলাপ হয় দারজিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে। চন্দ্রকান্ত একটা নামকরা কলেজের লেকচারার, ডকটরেট-এর জন্য গবেষণা করছেন। আর নমিতা পড়া শেষ করে মফঃস্বলের একটা প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারী নিয়েছে। চন্দ্রকান্তের মাসীর সঙ্গে নমিতার মায়ের অনেককালের বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে প্রথম পরিচয় হয়। মাসীকে নিয়েই চন্দ্রকান্ত দারজিলিং এসেছিলেন, আর নমিতা এসেছিল স্কুলের কিছু ছাত্রীকে নিয়ে। দুই দলই একই হোটেলে বাসা নিয়েছিলেন। নমিতা মেয়েটিকে মাসীর খুবই পছন্দ। আজকালকার মেয়েদের মত পুরুষালী হাবভাব নেই। আবার আগের দিনের মত লজ্জাবতী লতাও নয়। ছোটোখাট্টো সপ্রতিভ সুশ্রী মেয়েটিকে দেখলে সবারই ভাল লাগবে। বিধবা মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। মা দেশের বাড়ি আগলে পড়ে আছেন। বোনপোটিকে মাসী মানুষ করেছেন ছোটবেলা থেকে। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার দাঙ্গায় চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সবাই নিহত হন। গ্রামের অন্যান্য শরণার্থীদের হাত ধরে সাত বছরের ছেলে এপার বাংলায় এসে মাসীর সংসারে আশ্রয় যায়। মাসীর ছেলেমেয়েরা এখন বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ঘর বেঁধেছে

চন্দ্রকান্তকে সংসারী করতে পারলেই মাসী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। দারজিলিংয়ে আসার উদ্দেশ্য নমিতার সঙ্গে চন্দ্রকান্তের মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা করা। চন্দ্রকান্তের লম্বা-চওড়া চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না যে তিনি লাজুক আর ঘরকুনো। পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসেও কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন নি। ছেলেবন্ধুও তাঁর খুবই কম। সমবয়সী ছেলেমেয়ের চেয়ে প্রৌঢ় শিক্ষক ও শিক্ষকস্থানীয়দের সঙ্গে তাঁর বেশি পরিচয় তাঁদের সাহচর্য ও তাঁদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনাতে বেশি আনন্দ পান। ছাত্র হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম থাকলেও তার সাহচর্য কেউ কামনা করত না। তাঁর দাঁড়িগোফের জঙ্গল ভেদ করে আপ্যায়নের হাসি কদাচ ফুটে উঠতো বলে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলত। আর সেইটেই বোধ হয় চাইতেন চন্দ্রকান্ত। দারজিলিং-এর আবহাওয়া অথবা নমিতার ব্যবহার যে কোনো কারণেই হোক চন্দ্রকান্তের মুখে ঘন ঘন হাসি ফুটতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসে মাসীমা দুই হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মফঃস্বলের স্কুলের চাকরী ছেড়ে নমিতা শহরতলীর একটা নতুন স্কুলে চাকরী নিয়ে সেখানেই একটা ছোট ফ্ল্যাটে বিবাহিত জীবনযাত্রা শুরু করল। কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্যা দেখা দিল।

সেদিন শনিবার নমিতা স্কুল থেকে এসে গা ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরোজা খুলতেই দেখে যে চন্দ্রকান্ত দুজন ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জামা ছেঁড়া, চোখে আঘাতের চিহ্ন, চুল উড়ছে। ভয়ে ওর বুক কাঁপতে লাগল। ছেলেরা 'স্যারকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে নমিতাকে যে বিবরণ দিল তা শুনে হতবাক হয়ে গেল নমিতা। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। বিতর্ক সভায় চন্দ্রকান্তের উন্মাদের মত আচরণে শিক্ষক, ছাত্র সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। একজন সতীর্থ তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় চন্দ্রকান্ত নিজের চেয়ার ছেড়ে

উঠে গিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি। তখন কিছু ছাত্র তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করেছে। ছাত্রদের ধারণা 'স্যার' এ, জি, অর্থাৎ সতীর্থ অমল ঘোষের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্ধ হয়ে এই অদ্ভুত আচরণ করেছেন। একথাও তারা জানাতে ভোলেনি যে, চন্দ্রকান্তবাবু বোধহয় নেশা করেছিলেন কেননা সে সময় তাঁর পা টলছিল কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে গাজলা বেরুচ্ছিল।

ছাত্ররা চলে যাবার পর যখন ডাক্তার এলেন, তখন চন্দ্রকান্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডাক্তার চন্দ্রকান্তের বন্ধুস্থানীয়। তিনি নমিতাকে জানালেন যে, আগের দিন সন্ধ্যায় চন্দ্রকান্ত রাত জেগে পড়াশুনো করার জন্য তাঁর কাছে কিছু ওষুধ চেয়েছিল, কিন্তু তিনি ওষুধ খেয়ে রাত জাগার পক্ষপাতী নন. তাই কোনো ওষুধ দিতে রাজী হননি। ঘটনাটা তিনি আগেই শুনেছেন এবং তাঁরও ধারণা হয়েছে কোনো 'ড্রাগ' বেশি পরিমাণে খাবার ফলেই তিনি এই উন্মাদের মত আচরণ করেছেন। ভদ্র নম্র লাজুক স্বভাবের চন্দ্রকান্তের পক্ষে এই আচরণ অন্য কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মত বিশ্রামের পর চন্দ্রকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। লজ্জার ভাব কেটে যাবার পর তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না তাই স্নায়ুউত্তেজক একটা ওষুধের বেশ খানিকটা বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন। এতদিন তিনি সভাসমিতি এড়িয়ে এসেছেন বিশেষ করে বিতর্ক সভা সম্বন্ধে তাঁর মনে চিরকাল দারুণ ভয়। নমিতার সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি বিতর্ক সভায় যোগ দেবার কথা চিন্তাই করতেন না। নমিতাকে তিনি দু'একটা সভায় 'ডিবেট' করতে দেখেছেন আর তাঁর মনে হয়েছে তিনি যদি ওর মত সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তা হলে নমিতার চোখে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। নমিতা এই ছেলেমানুষী কথা শুনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল, তাঁর চুলের

মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে করতে জানাল যে তর্কাতর্কি করতে পারাটা খুব একটা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। ও-সব না করতে পারলেও চন্দ্রকান্ত তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন না। চন্দ্রকান্ত প্রতিজ্ঞা করলেন যে আর এ দুষ্কর্ম তিনি করবেন না। কিন্তু তিনি কথা রাখতে পারেন নি। ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি 'রিটালিন' জাতীয় উত্তেজক ওষুধ খেয়েই চলেছেন, প্রথমে দিনে দু'একটা বড়ি তারপর ডোজ বেড়ে বেড়ে এই চার বছরে প্রায় এক ডজনে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে খুবই সঙ্গোপনে স্ত্রীকে না জানিয়ে খেতেন, এখন আর লুকো-চুরির বালাই নেই। বিতর্ক সভায় যোগ দেবার প্রয়োজনে নয়। সেদিনকার ঐ লজ্জাকর আচরণের পর কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে মুখ দেখানোর প্রয়োজনে তাঁকে ওষুধের সাহায্য নিতে হয়েছে, পরে লেকচার দেবার প্রয়োজনে ওষুধের দরকার হয়েছে। এখন ওষুধ ছাড়া একদিনও চলে না। আবার ওষুধ খেয়েও তিনি নিজেকে চালু রাখতে পারেন না। সব সময় পা টলে, হাত কাঁপে, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন। কলেজের ও পাড়ার সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। বিভাগীয় বড়কর্তা ও অধ্যক্ষ তাঁকে স্নেহ করেন, তাঁরা ছ'মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই শর্তে যে এর মধ্যে তিনি চিকিৎসা করে এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হবেন ; অন্যথায় চাকরী থাকবে না। নমিতাও জানিয়েছে যে ছ'মাসের মধ্যে নেশা না ছাড়লে ও স্বামীকে পরিত্যাগ করবে।

এই ইতিহাস আমি চন্দ্রকান্তবাবুর বন্ধু ও নমিতার কাছ থেকে সংগ্রহ করি। নমিতা মেয়েটি বেশ দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। প্রথম দিনই ও আমাকে খুব অল্প কথায় জানালো যে সব রকম চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে ঝুমুরের মাথা ছুঁয়ে প্রতিদিন শপথ করেন চন্দ্রকান্তবাবু, আর পিল খাবো না, আর পিল খাবো না, আর পিল খাবো না। দুটো দিন বড় জোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তারপর যা ছিলেন তাই। ডাক্তাররা আবার আস্কারা

দিনে ওঁর অভ্যাসটা কায়েমী করে দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন—হঠাৎ একসঙ্গে ছেড়ে দিলে 'উইথড্রয়াল সিম্পটম' দেখা দিতে পারে, একটু একটু করে মাত্রা কমিয়ে ছাড়তে হবে। একবার নার্সিং হোমে তিন মাস আটকে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে; বেরিয়ে এসে দু'একদিন বাদেই আবার যথারীতি নেশায় মেতেছেন। এত ওষুধ পান কোথা থেকে? ঐ ওষুধগুলো তো বিনা ব্যবস্থাপত্রে দেবার কথা নয়। নমিতা হেসে বলল টাকা দিলে এই শহরে সবই পাওয়া যায়। এই তার শেষ চেষ্টা। এবপর আর কান্নাকাটিতে ভুলবে না। ঝুমুরকে নিয়ে ও দেশে মার কাছে চলে যাবে। ঐ স্বার্থপর অমানুষের মুখ দেখতেও তার ঘৃণা হয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম চাকরী হারানোর ভয়ের থেকে স্ত্রী-কন্যাকে হারানোর ভয়টাই তাঁকে বেশি করে পেয়ে বসেছে। আমাকে তিনি নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি নিজেকে ভালবাসেন বটে কিন্তু স্ত্রী-কন্যাকেও ভালবাসেন। মাসীকেও ভালবাসতেন। তাঁর অভিযোগ নমিতাই তাঁকে ভালবাসে না। সে সব বিষয়ে নিজেকে তাঁর থেকে বড় মনে করে।

আমিতো আগে এমন ছিলাম না। লজ্জা ভয় আমার ছিল বটে। কিন্তু ক্লাসে লেকচার দিতে ভয় হত না, তার জন্যে পিল খেতে হত না। নমিতা চলে গেলে আমি কার কাছে থাকব? মাসীমা বেঁচে থাকলে আমি এত ভাবতাম না আমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছে থাকতে পারতাম। ও বলে আমি নাকি পশুর মত শুধু নিজেকেই ভালবাসি, ওকে ভালবাসি না। ঝুমুরকে ভালবাসি না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে পিল খাই। ওদের ভালবাসি। অবিশ্যি তা ওরা বুঝতে পারে না। বলে ওদের নিয়ে বেড়াতে যাই না, সিনেমায় যাই না, জিনিস কিনে দিই না।

—মাঝে মাঝে আপনি ওদের মারধোর করে থাকেন শুনলাম।

একদিন, কি বড়জোর দু'দিন। ডাক্তার আমাকে তিন বড়ি করে

বলেছিল। ও আমার বরাদ্দ ডোজ দেয়নি, তাই একটা পেপার ওয়েট তুলে—এই বলে মুঠো থেকে গোটা কতক বড়ি মুখে পুরে, আর এক ঢোক জল খেলেন ভদ্রলোক। আমি ইচ্ছে করেই বাধা দিলাম না। ওকে প্রাণখুলে কথা বলতে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

—ছোট মেয়েটার হাত মচকে দিয়েছিলেন একদিন।

—সেতো 'এক্সপেরিমেন্ট'। আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঝুমুর নিজেকে ভালবাসে কিনা। হাত মুচড়ে ধরলাম ও চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, বুঝলাম সে নিজেকে ভালবাসে, আমি নিজেকে ভালবাসি, ঝুমুরকেও ভালবাসি, নমিতাকেও ভালবাসি।

এতক্ষণে 'ড্রাগের' ক্রিয়া শুরু হল। জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে টেনে চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন : যাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ, যারা নিজেকে ভালবাসে না তারা অন্যকেও ভালবাসতে পারে না। বৃষ্টির জলের মত ভালবাসা ঈশ্বরের করুণা। নদীনালা ছাপিয়ে যাবার পরই জলধারা উপচে ওঠে, পাড়ের সব কিছুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। ভালবাসাও তেমনি নিজেকে ছাপিয়ে অন্যকে সঞ্জীবিত করে। নিজেকে ভালবাসা স্বার্থপরতা কেন হবে? নিজেকে ভাল না বাসলে আমাকে ভালবাসবে কি করে? আমি নিজের মধ্যে প্রেমের দেবতাকে অনুভব করি। আমার মন ভালবাসায় ভরা। দেহমন উপচে সেই ভালবাসার ধারা নমিতাকে, ঝুমুরকে স্নান করিয়ে দেবে—কিন্তু নমিতা আমাকে সুযোগ দিচ্ছে না।

একটা হতাশার ভঙ্গি করে চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন। নেশা ও'র ভালমতই হয়েছে।

—আপনি কি সত্যিসত্যি ভালবাসতে পারেন? যে ভালবাসে সেতো অন্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে। আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের অনুরোধে তুচ্ছ নেশাই ছাড়তে পারছেন না! এ কি রকমের ভালবাসা!

—আমি নেশা কেন, সব ছাড়তে পারি কিন্তু একটি শর্তে।

কি সে শর্ত ?

চোখের পাতা জুড়ে আসছে অতি কষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : এই সভ্য মানুষের সমাজ থেকে আমাকে বাইরে কোথাও যদি নিয়ে যায় আমি নেশা ছাড়তে পারি। আমি এইসব মানুষের মধ্যে থাকতে চাই না। কোনো পাহাড়ের গুহার মধ্যে কিম্বা কোনো জনহীন দ্বীপের মধ্যে গিয়ে থাকলে আমি নেশা ছাড়াই বাঁচতে পারি। আমি এই রেশারেশি এই প্রতিযোগিতার সমাজে থাকলে বাঁচবো না।

—সমাজের বাইরে কি কেউ থাকতে পারে ?

—সমাজ ছাড়াই মানুষ বাঁচতে পারে, নিজেকে জানতে পারে, চিনতে পারে।

—ঈশ্বর ছাড়া কেউ তা পারে না।

- তাহলে আমি ঈশ্বর। চন্দ্রকান্ত চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। স্থির দৃষ্টিতে সামনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন : তা হলে আমি ঈশ্বর, আমি এ যুগের ঈশ্বর। সমাজের বাইরে আমি বেঁচে থাকব বিশ্বসৃষ্টির অনেক আগে আমি আমাকে আমার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সেই অজাতশত্রু মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমি আকাশ আর সমুদ্র। আমাব স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে আমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে আমার আত্মজনকে হত্যা করতে অন্য কোনো প্রাণী তখনও সৃষ্টি হয় নি। মাঝে মাঝে পিল খেয়ে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। বিশাল এক রণক্ষেত্র, শহরের বুক চিরে মুহূর্মুহু কামান গর্জে উঠছে। বিরাট এক ট্যাঙ্কের কামানের ওপর দাঁড়িয়ে খোলা তলোয়ার হাতে আমি চলেছি। একচক্ষু দৈত্যের মত সামনের সার্চলাইট থেকে আলো ফেলে গর্জন করে ছুটে চলেছে ট্যাঙ্ক। সারিবাঁধা ক্ষুদে মানুষের দল মাটিতে শুয়ে পড়ে আমার কাছে, তাদের ঈশ্বরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে তাদের-

কাতর আর্তনাদ আমার কানে পৌঁছুচ্ছে না। আমি ওদের জীবন-বিধাতা ওরা আমাকে হিংসে করে, ভয় করে। কিন্তু আমি ওদের জীবন ভিক্ষা দিতে পারি না, তাহলে আমি বাঁচব না। আমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে ওরা—আমাকে ওরা—

কথা একেবারে জড়িয়ে গেল। টলতে টলতে পাশের সোফায় গিয়ে দেহটা এলিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্তবাবু। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের কোণে জল। সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন।

পরের দিন অনেকটা শান্ত দেখলাম চন্দ্রকান্তকে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাবার হত্যাকাণ্ড বালক চন্দ্রকান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। টুকরো টুকরো করে তাঁকে কেটে ফেলতে দেখেছেন। তখন তিনি উঠোনের একপাশে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। দেখতে দেখতে বোধহয় চেতনা হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে মনে পড়ে পাড়ার এক প্রৌঢ়ার কোলে নৌকোর মধ্যে বসে। তিনি আরও বললেন, তাঁরা গ্রামের জমিদার ছিলেন, তাঁর ঠাকুরদার আমলে নাকি গরীব প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

—এক প্রজন্মের ঋণ অন্য প্রজন্মে শোধ করেছে প্রজারা—এই সব ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারি ?

অনেকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। মনে হল বোধ হয় সেদিন পিল খেতে ভুলে গেছেন।

সকলকে আমি হিংসে করি, ভয় করি। নমিতাকেও হিংসে করি বোধহয়। নিজেকে হীন মনে হয়, অভিশপ্ত মনে হয়। বিয়ে না করাই বোধহয় ভাল ছিল। কিছুতেই আমি নিজেকে নমিতার সমকক্ষ ভাবতে পারি না। এই পিল খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অসামাজিক কাজ সজ্ঞানে করেছি বলে মনে পড়ে না। তবু কেন মনে হয় আমি কলঙ্কিত। আমাকে হারিয়ে দেবার জন্য হীন প্রতিপন্ন করার জন্য সকলেই ষড়যন্ত্র করছে ? মনে হয় প্রথম দিন থেকেই অমল ঘোষ

আমাকে কৃপার চোখে দেখছে। তাই তো সেদিন পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ওকে শাস্তি দিতে। বিয়ের পর নমিতা অতিমাত্রায় সহানুভূতি দেখাত, বড্ড বেশি ভালবাসার কথা বলত। আমি সহ্য করতে পারতাম না। মনে হত সব বানানো সব সাজানো। নমিতাকে আমি মিথ্যে বলেছি, বিতর্ক-সভার অনেক আগে থেকে বিয়ের পরদিন থেকেই আমি পিল খেতে শুরু করি। এম. এ পরীক্ষার সময় এক বন্ধুর পরামর্শে কিছুদিন রাত জাগবার জন্য ঐ পিল খেয়েছিলাম। বিয়ের পর মনে হল, পিল না খেয়ে আমি নমিতার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারব না, ওর গায়ে হাত দিতে পারব না, ওকে চুমু খেতে পারব না। তখন শুধু সন্ধ্যার সময় এক-আধটা খেতাম। সেদিন বিতর্ক সভার আগে গোটা চারেক একসঙ্গে খাই। তারপর যখন অমল ঘোষ আমার থিসিসের বিষয় নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে আরো গোটা চার পাঁচ পিল খাই। 'আত্মপ্রেম ও করুণা'—এই নিয়ে আমার গবেষণা। ডাক্তারবাবু, আমি কি সুস্থ হতে পারব? পিল ছাড়তে পারব? নমিতা আমাকে হয়তো অনুকম্পার চোখে দেখে, হয়তো ভালবাসে না। কিন্তু আমি ওদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না। আমাকে এই মারাত্মক আসক্তির হাত থেকে কি বাঁচাতে পারবেন?

৫
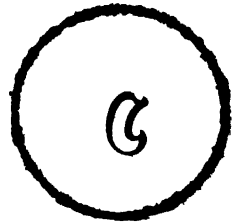
প্রসূনবাবুর মুখে স্ত্রী লতিকার সঙ্গে তাঁর মনান্তরের বিবরণ শুনলাম।

প্রায় দশ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, তখন ওর বয়স ছিল ষোলো, আমার বত্রিশ। প্রথম বছর পাঁচেক বেশ শান্তিতেই ছিলাম, কিন্তু গত পাঁচ বছরে ওর অত্যাচারে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। বছরে তিন-চার বার ও একেবারে ক্ষেপে যায়। সামান্য কথাকাটা-কাটি থেকে একেবারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। ছেলেদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে, বাধা দিতে গেলে আমার গায়েও দু-চার ঘা দিতে কসুর করে না। চ্যাঁচামেচির ফলে বাড়ী শুদ্ধ লোক জড় হয়, মাঝে মাঝে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, আশে-পাশের বাড়ীর বৌ-ঝিরা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। আমি রেগে কোন কথা বললে : হন-হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সোজা ট্যাকসি করে যায় ভবানীপুর থেকে দমদমে দিদির বাড়ী। ছেলেটার বয়স আট, মেয়েটার পাঁচ। এখন ওরা মায়ের জন্য কান্নাকাটি করে না। কিন্তু প্রথম প্রথম ছেলেটা তখন চার, মেয়েটার এক বছরও পেরোয় নি, ওদের কান্নাকাটিতে বিব্রত হয়ে আমি ফোন করে ওর দিদির বাড়ী গিয়ে মান ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসতাম। অনেক বার আমাকে

সম্মান খুইয়ে দমদম ছুটতে হয়েছে বাচ্চা ছুটোকে নিয়ে। বাড়ীতে এর জন্যে আমার পজিশন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দুই ভাই। আমিই বড়। ছোট ভাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, বাবা-মাও আমাকে ভালবাসেন—তাঁদের কথা বলছি না। আমার পজিশন নষ্ট হয়েছে বৌমার কাছে। বৌমা লেখাপড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবার বিরাট কারবার, খানকতক বাড়ী আছে এই শহরে। নতুর পাগলামিটা ছোট ভাইয়ের বিয়ের পরই শুরু হয়েছে। তাতেই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বৌমাকে ও হিংসে করে আর সেটা বাড়ি শুদ্ধু সবাই বুঝতে পেরেছে।

—কি নিয়ে হিংসে করে? একটু বুঝিয়ে বলুন।

· তা হলে আর একটু গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। আমাদের সোনা-রূপোর কারবার। তিন পুরুষ ধরে আমরা ব্যবসাই করে আসছি। গুরুর আশীর্বাদে এই কলকাতা শহরে আমাদের খানচারেক দোকান, কারখানায় পঁচিশ-তিরিশজন লোক কাজ করে। এ ছাড়া আমরা আজকাল রপ্তানীর কারবারেও নেমে পড়েছি। দোকানগুলো সব বাবা দেখাশুনো করেন আর নতুন ব্যবসাটা পুরোপুরি ছোট ভাই-এর হাতে। আমি ডাক্তারবাবু একটু শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঐসব কারবারের ঝুটঝামেলা আমার সহ্য হয় না। ছোটবেলা থেকে ধর্ম-কর্মের দিকেই আমার ঝোঁক।

আর এই নিয়ে ওর যত আক্রোশ। আমি কেন পূজুরী বামুনের মত থাকব? আমি কেন অফিসে যাব না? দোকানে বসব না? কেন কান্তির, মানে আমার ছোট ভাই-এর মত আমি একখানা আলাদা গাড়ী পাব না? কেন বড় ভাই হয়েও বাড়ীতে আমার প্রেষ্টিজ নেই?····দিনরাত্র এই সব নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা।

—আপনি কি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে একেবারেই থাকেন না? বাড়ীর কোন কাজ আপনি দেখাশোনা করেন?

—ব্যবসা ছাড়া কি বাড়ীর আর কোন কাজ নেই? অনেকটা জায়গা নিয়ে আমাদের বাড়ী। ভাড়া দেবার জন্যও বাবা খানকতক বাড়ী করিয়েছেন। এ-সবের মেরামতি তদারকি আমাকেই করতে হয়। তাছাড়া গৃহদেবতা আছেন, তাঁর নিত্যকর্মের সব ব্যবস্থাই তো আমাকে দেখতে হয়। এ-সব লতুর কাছে কাজই নয়। রেগে গেলে বলে এ সব নাকি দারোয়ান গোমস্তার কাজ। গড়িয়াতে আমাদের একটা বাগান আছে, ফুলফল, তরিতরকারীর তত্ত্বতলাশ করতে সপ্তাহে ছু-তিন দিন সেখানে যেতে হয়। সেটা নাকি মালির কাজ। আসলে বৌমাকে ও দেখতে পারে না। বৌমা কেন রোজ গাড়ী করে ঘুরবে, বৌমা কেন এত বড় ঘরের বউ হয়ে মাষ্টারনীর মত ছেলে পড়াতে যাবে।

—আপনার ছোট ভাই-এর বউ কি কাজ করেন?

—বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে গাড়ী করে তুপুরবেলা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। গাড়ীখানা ওর বাবা দিয়েছেন। আমার স্ত্রী খুব দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বৌমাকে তাই ও একেবারে দেখতে পারে না! এখন ভাবি—কেন যে মায়ের কান্নাকাটিতে বিয়ে করতে রাজি হলাম। বাড়ী শুদ্ধ সবার নার্ভের ওপর দারুণ চাপ পড়ছে, লতুর এই পাগলামি আমরা সহ্য করতে পারছি না। ডাঃ সাহা বলেছেন ওকে মনের রোগের হাসপাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা রাজী হতে পারছি না। মা-বাবা তো ভাবতেই পারেন না যে তাদের বাড়ীর বউ পাগলা গারদে থাকবে। চারদিকে একেবারে ঢি ঢি পড়ে যাবে, আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আমরা ডাক্তার সাহাবকে বলে দিয়েছি—না। এমনি বাড়ীতে রেখে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

—রোগীকে আমি দেখি নি, জানি না। আমি কি করে বলব? তিনি যে পাগল—এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত হলেন কি করে?

এইবার একটু হাসলেন ভদ্রলোক। পাঞ্জাবীর হাতা তুলে

দেখালেন তাঁর বাঁ হাতের অনেকটা জায়গা ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। লতুর কীর্তি। ছেলেটাকে কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল, হাত দিয়ে আটকে দিতে, ক্ষেপে গিয়ে পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে ওর হাতে কয়েকবার আঘাত করেছে। ছেলেটাকে তিন মাস চার মাস অন্তর দু-একটা ষ্টিচ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়। এ যাবৎ বরাবর দু-একদিনের মধ্যেই দমদম থেকে ফিরে এসেছে। যখন ফিরে আসে তখন ওকে দেখলে মনেই হবে না যে দু দিন আগে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে। পাগলামির ঝোঁক যেমন হুট করে আসে, তেমনি ঝট করে চলে যায়। এবার স্পেলটা কাটছে না। আজই ওর দিদি ফোন করেছিলেন— এবার অন্য রকম হয়ে গেছে, কিছুতেই ভবানীপুর ফিরবে না, ভিক্ষে করে খাবে তবু শ্বশুরবাড়ীর অন্ন মুখে তুলবে না।

—চিকিৎসাতে তিনি রাজী হবেন কি ?

— ওর দিদি বলেছেন রাজী করতে পারবেন। আমার ওখানে ফেরার জন্যে নয়, রাগ কমানোর জন্যে ও-চিকিৎসা করতে রাজী আছে। রাগ পড়ে গেলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতে বলে—আমি কি করব ? আমি যে সামলাতে পারি না। রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের কাছে ও নাকি প্রার্থনা করে, রাগ কমানোর জন্যে ঠাকুরকে ডাকে, কিন্তু রাগ কমে না। ওষুধপত্রও অনেক খেয়েছে শুধু ঘুম বেড়েছে—আর কোন ফল হয় নি। ওষুধের ঘোরের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মারধোর চেঁচামেচি করে না—এই পর্যন্ত।

লতিকা যা বলল তার সারমর্ম এই : আমার ছেলে-মেয়েদের হেনস্থা করা হয় ও বাড়ীতে। কারণ কি জানেন ? আমরা গরীব। ছেলে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াত, কিছুতেই সংসার করবে না, পড়াশুনো কাজকর্মে কোন দিন মন ছিল না। শ্বশুর ভাবলেন যেমন করে হোক ছেলের বিয়ে দিতে পারলে বুঝি তাকে ঘরমুখো করতে পারবেন। এক বিয়ে বাড়ীতে আমাকে দেখে আর গান শুনে শাশুড়ীর খুব পছন্দ হল। তখন সত্যিই দেখতে ভাল ছিলাম, গানের

গলাটাও ভগবান ভালই দিয়েছিলেন। ভজন গাইতে গেলে এখনও চোখের জল আটকাতে পারি না। স্বামীকে অনেক কসরৎ করে ওঁরা আমার গরীব দিদির বাড়ীতে এনে আমার গান শোনালেন। স্বামী ঠাকুরদেবতার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। চেহারা দেখে নয়, উনি বলেছেন গান শুনে ওঁর মন টললো, বয়সের ফারাকটা তখন আর ওঁর কাছে তেমন কিছু একটা বেশি মনে হল না। উনি রাজী হলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বংশের বড় ছেলেকে ঘরমুখো করতে পেরে ওরা সত্যি খুশী হলেন। বিয়ের পর পাঁচ বছর স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। রূপকথার সেই ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে যেন রাজরাণী হল। আমাকে ঘিরে রোজ সন্ধ্যায় আসর বসত। আমি ভজন গাইতাম, পদাবলী শোনাতাম, বাড়ীর ঝি-চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভার সব উঠানে জড় হয়ে আমার গান শুনত। শাশুড়ী আর স্বামী নিয়মিত হাজির হতেন গানের আসরে। স্বামীর উড়োনচণ্ডীপানা অনেকটা কমল, তীর্থভ্রমণের নেশাটা কাটল। আমাকে নিয়ে ফি বছর গরমে পাহাড়, শীতে অন্য কোন জায়গায় বেড়াতে যেতেন। চার বছরে আমি দুটো বাচ্চার মা হলাম। এই সময় নানা বিদ্যাবিশারদ হয়ে কান্তি বিদেশ থেকে ফিরল। তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। নতুন ব্যবসা শুরু করল সে। সেই ব্যবসা-সূত্রে আলাপ হল গীতার বাবার সঙ্গে। কিছু দিনের মধ্যেই গীতার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হল। গীতা বি. এ পাশ ; গীতা গাড়ী চালায়। গীতা পিয়ানো বাজায়, বাড়ীর সবাই রাতারাতি গীতার ভক্ত হয়ে উঠল। আমার ছেলেটাকে তো গীতা একেবারে বশ করে ফেলল। কাকীর কাছে নাওয়া-খাওয়া, কাকীর সঙ্গে গাড়ী করে বেড়ানো, কাকীর কাছে ঘুমুনো—আমার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় চুকেই গেল। শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী সকলকেই যেন তুক করল গীতা। জানেন বোধ-হয় ওদের গয়নার দোকান আছে। নতুন ডিজাইন তৈরী করে গীতা। ঠাকুরপোর বাইরে গয়না, খেলনা পাঠাবার ব্যবসার ব্যাপারেও গীতার

পরামর্শ নিতে হয়। এতসব করেও গীতা দুপুরে গাড়ী করে অন্য-বাড়ীর কাজের লোকদের লেখাপড়া শেখাবার স্কুলে যায়, নিজে মাষ্টারী করে। আমার স্বামী—শুধু স্বামী কেন বাড়ীর সবাইয়ের মুখে শুধু গীতার প্রশংসা। আমার গানের আসরের শ্রোতা কমতে লাগল, বছর খানেকের মধ্যে আসর উঠেই গেল। বিলিতি বাজনার টংটং শোনবার জন্যে ভিড় জমতে লাগল গীতার ঘরের আশেপাশে। এক সন্ধ্যায় পিয়ানোর বাজনা শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে একটা কিছু বাজাতে গেলাম, ভাল লাগল না, সব যেন কেমন বেসুরো বেয়াড়া হয়ে গেল। এই সময় স্বামী কি একটা কাজ করে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম বোধহয় পিয়ানোর আসর থেকে আমার ভজন শুনতে এসেছেন। আমি ওর ফেভারিট গানটা—যেটা শুনে উনি বিয়েতে মত দিয়েছিলেন, সবে ধরেছি এমনি সময় উনি বললেন, লতু তোমার কাছে মাথা ধরার কোনো ট্যাবলেট আছে? আমার ড্রয়ারে দুটো ট্যাবলেট ছিল খুঁজে পাচ্ছি না। গীতার পিয়ানো শুনতে আজ একসপোর্ট কণ্ট্রোলের বড় কর্তারা এসেছে কিন্তু ও মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমার গান বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল আমার গলাটা যেন উনি দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছেন। মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল, হারমোনিয়ামের ডালাটা দিয়ে টেবল ল্যাম্পের ওপর আঘাত করলাম, বাল্বটা ভেঙ্গে গেল, ঘর অন্ধকার কিন্তু আমার চোখের সামনে আলোর ঝিলিমিলি....

প্রথম দিনের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে মেয়েটির চোখেমুখে অস্বাভা-বিক ভাব ফুটে উঠল। মুখে কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোটটা কামড়ে ধরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : আমার ভয় হচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়েছি। এইরকম হয় বুঝলেন। তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। সবকিছু ভেঙ্গেচুরে

তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। তখন বোধহয় আমি মানুষ খুন করতেও পারি। আমি পাগল নই ডাক্তার বাবু, আমার মধ্যে কে যেন ভর করে তখনকার মত জ্ঞানগম্যি লোপ পায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখার অনেক ওষুধ খেয়েছি। অনেক তেল মেখেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমি চাই না আমি আমার খোকনকে মারি, আমি চাইনা চ্যাঁচামেচি করে বাড়ির লোকের হাসির খোরাক জোগাই, কিন্তু আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পারি না। এর জন্য দায়ী কে জানেন? ঐ উনি—এই বলে স্বামীর দিকে আঙুল তুলল।

--উনি কি আপনাকে অযত্ন করেন?

ওঁর যত্ন-অযত্নের কি দাম আছে? বাড়ীর দারোয়ানের যেটুকু ক্ষমতা আছে ওঁর সেটুকুও নেই। বাড়ীর বড় ছেলে হয়েও ওঁর কোনো ক্ষমতা নেই। মার্কেটে যেতে গেলে একটা গাড়ী পাব না, সিনেমায় যেতে গেলে ট্যাকসী ডাকতে হবে, অথচ বাড়ীতে তিন তিনখানা গাড়ী। আমার দরকার—

এইখানে স্বামী বাধা দিলেন। তিনখানা নয় দুখানা; একটাতো গীতার নিজস্ব। আমার ছেলেমেয়েকে গীতা নিজে গাড়ী করে স্কুলে দিয়ে আসে নিয়ে আসে; অন্য দুখানা আপিস-দোকানের কাজে রাত আটটা পর্যন্ত আটকে থাকে।

ওকে ওঁর কথা বলতে দিন, প্রসুনবাবু বাধা দেবেন না। আচ্ছা আপনি শ্বশুরবাড়ী ফিরতে চাইছেন না কেন? রাগ কমানোর চিকিৎসা তো বাড়ী থেকেই হতে পারে।

ওখানে আমাকে কেউ চায় না। ছেলে-মেয়েদেরও ওঁরা বুঝিয়েছেন—আমি পাগল, আমার কাছে আসতে নেই। তাছাড়া ওখানে আমার অবস্থা দাসীবাঁদীরও অধম। একটা শাড়ী কিনতে হলেও আমাকে দরবার করতে হয় স্বামীর কাছে, স্বামীকে দরবার করতে হয় তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে—

আবার বাধা দিলেন প্রসুনবাবু: মিথ্যে কথা বলো না, কোন

জিনিসের জন্য তোমাকে দরবার করতে হয় নি কোনদিন। ডাক্তারবাবু আমাদের সেই সেকেলে যৌথ পরিবার। কাপড়জামা কেনাকাটার ব্যাপার বছরে তুবার। পূজোতে আর নববর্ষে। মাঝে কারুর কোন শখ হলে বাবাকে জানাতে হয়। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে—বলুন তো?

—গীতা তোমার বাবার কাছে হাত পাততে যায়? সেদিন ওর ছোট বোনকে দেড় হাজার টাকার রেকর্ড প্লেয়ার দিল, তোমার বাবার কাছে দরবার করেছিল সে জন্যে? ঠাকুরপোর অ্যাকাউন্টে টাকাটা খরচা লেখা হল? আর আমার বেলায় পঞ্চাশ টাকার একটা শাড়ীর জন্যে তিন দরবারে ধর্ণা দিতে হয়—উত্তেজিত হয়ে উঠল মেয়েটি।

—আমি সেকেলে মানুষ, আজে-বাজে জিনিষ কিনে টাকা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার নিজের বছরে তু'খানা ধুতি আর তিনটি হাফসার্টের বেশি কিছু দরকার হয় না। রেকর্ডপ্লেয়ার টেপরেকর্ডার, হাজারো রকমের গ্যাজেট নিয়ে মেতে থাকা এ যুগে একটা ব্যাধি। মানুষের প্রয়োজন ইচ্ছেমত বাড়ানো যায়। আমার তাতে সায় নেই—স্বামী গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করলেন।

—নিজের বেলায় আর নিজের বৌ-এর বেলায় যত ধর্ম্মজ্ঞান আর বক্তৃতা। ঠাকুরপোর বেলায়, গীতার বেলায় কই—এসব বক্তৃতা কোথায় তোলা থাকে? ভণ্ড তপস্বীর মুখোশ খুলে দিতে আমার এতটুকুও আটকাবে না বলে দিচ্ছি। ক্ষমতা নেই তাই বল! তা না যত সব বড় বড় কথা!—হাঁপাতে লাগল মেয়েটি।

স্বামীর কোন উত্তেজনা নেই। আমি ইঙ্গিতে তাঁকে বাইরে যেতে বললাম।

স্বামী বাইরে যেতেই লতিকা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কয়েক মিনিট ধরে কাঁদল, তারপর চোখ মুছে, চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে ভাঙা গলায় বলতে লাগল: আসলে গরীবের মেয়ে বলে স্বামী আমাকে নিজের লোক ভাবতে পারেন না, মনে মনে আমাদের বাড়ীর

সবাইকে ও'দের থেকে ছোট মনে করেন। শ্বশুর-শাশুড়ী অন্য রকম, তাঁরা সত্যিই ভালমানুষ, আমাকে গরীব বলে কোনদিন অবহেলা করেছেন বলে মনে হয় না।

—তবে আপনি ও বাড়ীতে ফিরে যেতে চান না কেন?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কি করে যাই বলুন। এবার রাগের মাথায় শ্বশুরমশাইকে যা তা বলে গাল দিয়েছি। একটা গেলাস ছুড়ে মেরেছিলাম, ভাগ্যি ভাল, তাঁর গায়ে লাগে নি। আমি যেতে চাইলেও স্বামী আমাকে নেবেন না।

—কি হয়েছিল সেদিন? কেন এত রেগে গিয়েছিলেন?

অশ্রুসজল চোখে মেয়েটি ঘটনার বিবরণ দিল: ছেলেমেয়েকে ওদের কাকী আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আমার চেয়ে ওরা কাকীকে বেশি ভালবাসে। আমারই দোষ। অত মারধোর করলে ভালবাসবে কি করে? তাছাড়া বাড়ীর কাজের লোকেরা পর্যন্ত যাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাকে ওরা শ্রদ্ধা করতেও পারে না। সেদিন গীতাদের বাড়ীতে ও বাড়ীর সবার নেমন্তন্ন, আমারও। গীতার দাদার ছেলের অন্নপ্রাসন হচ্ছে খুব ঘটা করে। রাত পর্যন্ত আমি ভালই ছিলাম, গীতার বাড়ী যাব বলে ভল্ট থেকে গয়নাগুলো আনিয়ে রেখেছি, শাড়ী ব্লাউজ গুছিয়েছি, সকাল সকাল তিনটে গাড়ী করে আমরা বেরিয়ে পড়ব ব্যবস্থা হয়েছে। হঠাৎ সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে রেডিওতে সেই গানটা শুনলাম। যেটার কথা একটু আগে আপনাকে বলেছি। স্বামীর খাটের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত ছোঁয়ালাম। আমার সারা গায়ে কি একটা শিহরণ·······মনে হল যেন দশ বছর আগের সেই দিনটাতে ফিরে গেছি। ভোরের নরম আলো মৃদু বাতাস আমাকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল। ও'র ঘুম ভাঙছে না দেখে রাগ হল। একটু জোরে ধাক্কা দিতে উনি ধড়মড় করে উঠে বললেন -কী ব্যাপার? আমি বললাম রেডিওতে সেই গানটা হচ্ছে। হাই তুলে বললেন, রেডিওটা বন্ধ করে দাও, মিছিমিছি

ঘুম ভাঙিয়ে দিলে বলে আবার শুয়ে পড়লেন। আমার ভেতরটা কেমন করে উঠল। রেডিওটাকে তুলে নিয়ে মেঝের ওপরে ফেলে দিলাম। বেশ জোরে শব্দ হল। স্বামীর ঘুম ভাঙল না, ভাঙলেও উনি সাড়া দিলেন না। আমার রাগ-অভিমান জানাবার জায়গা নেই ভেবে বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। তখুনি দুমদাম করে তেতালায় উঠে গীতার দরজায় ঘা দিলাম। চোখ মুছতে মুছতে গীতা বেরিয়ে আসতেই বললাম—খোকনকে তুলে দাও এখুনি। ওর চোখে মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল কিনা দেখবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে টেনে তুলে টানতো টানতে নিজের ঘরে এনে ওকে কাপড় জামা পরে রেডি হতে বললাম। ততক্ষণে স্বামী জেগে উঠেছেন, গীতা নেমে এসেছে, খোকন কান্না জুড়ে দিয়েছে, মেয়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড, কিন্তু সে সব বোঝার মত মনের অবস্থা ছিল না। কোথায় যাবে এত সাত সকালে ? একটু বাদেই তো গীতাদের বাড়ী যেতে হবে। স্বামী বার বার এই সব কথা বলছিলেন, সবটা আমার কানে যাচ্ছিল না। সুটকেস গোছাতে গোছাতে বললাম, স্বপ্ন দেখেছি দিদির খুব অসুখ, আমাকে এখুনি যেতে হবে। গীতা বলল, লোক পাঠিয়ে খবর নিতে, স্বামী বললেন তিনি পাশের বাড়ীতে ফোন করে খবর নিচ্ছেন, স্বপ্ন দেখেই ছুটতে হবে কেন ? আমি কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। ওরা আমায় চেনে কাজেই বাধা না দিয়ে বলল,—তুমি যাবে যাও কিন্তু ছেলেমেয়েকে নিতে পারবে না। ওরা যেতেও চায় না। আমি তখন ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছি আর বোধহয় বলছি—যেতে হবে, যেতে হবে। আমার ছেলে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাব, কেউ বাধা দিতে পারবে না। কখন শ্বশুরমশায় এসে ঘরে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি। তিনি বোধ হয় একটু রুক্ষভাবে বলেছিলেন—এ সব পাগলামি ছেড়ে দাও বউমা, আমি এখুনি দারোয়ান পাঠিয়ে দমদম

থেকে খবর আনছি। গাড়ী করে যাবে, গাড়ী করে আসবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তুমি দিদির খবর পেয়ে যাবে। আমার মনে আছে, বেশ মনে আছে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম আর বলেছিলাম : বেরিয়ে যান বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে অসভ্য ইতর সব। ভোর বেলায় হল্লা করতে এসেছেন আমার ঘরে। তারপর টিপয় থেকে জলভরা গেলাশটা ছুঁড়ে মেরে নিজের সুটকেশটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

লতিকা আবার আস্তে আস্তে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।
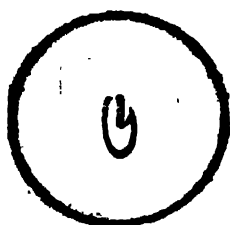
সরাসরি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম: তুমি এরকম করলেতো পাড়ায় তিষ্ঠুতে পারবে না। বাড়ীওয়ালা বড়লোক, পাড়ার লোকেরা তার হাতধরা, তাকে চটিয়ে ও-বাড়ীতে থাকবে কি করে?

—আমি ও বাড়ীতে থাকতে চাই না; ওকেতো রোজ বলছি বাড়ী বদলাও. ও-আমার কথায় কান দিতে চায় না।

—চাইলেই কি আজকাল খুশীমত বাড়ী বদলানো যায়? তপন বলছিল, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করে পাঁচশো টাকা অগ্রিম দিয়ে অনেক তদ্বির তদারক করে বাড়ী পেয়েছে, এখনও ছ'মাস হয়নি, বাড়ী যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও মিলেও যায়, অগ্রিম টাকাটাইতো জলে যাবে। কিছুদিন অন্তত মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাও।

মেয়েটি ফোঁস করে উঠল: ওরা আমাদের ঘরের দিকে ধোঁয়া পাঠাবে, আমার রান্নাঘরে নোংরা ফেলবে, আমাকে পাগল বলবে আর আমি মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাব? না—সে আমি পারব না, আপনি বললেও না। বড়লোক বলে যা খুশী করবে, যা ইচ্ছে বলবে? আমিও অমনি বানের জলে ভেসে আসিনি, আমার মামাও একটা কম কেওকেটা নয়। হ্যাঁ—

ওর স্বামীর দিকে তাকাতেই সে বলল : ওদের রান্নাঘর দোতলায়, আমাদের ফ্ল্যাট একতলায়, ওদের ধোঁয়া আমাদের ঘরে কি করে আসবে বলুনতো ?

স্ত্রী, মানে তপতী উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমার টেবিল থেকে একখানা মোটা বই তুলে উঁচু থেকে টেবিলের ওপর ফেলল, টেবিলের আলোটা উল্টে গেল, ছাইদানিটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। তপন—ওর স্বামী দ্রুতপদে এসে ওর হাত চেপে ধরল, ও-বোধহয় আর একখানা বই তুলে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টায় ছিল। বাধা পেয়ে তপতী জোর করল না, নির্বিকার সরল মানুষের মত বইখানা যথাস্থানে রেখে নিজের চেয়ারে বসে আলোটা ঠিক করল, নীচু হয়ে মেঝে থেকে ছাইদানিটা তুলে রাখল। ঠাণ্ডা গলায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে পাখাটা আর একটু জোরে চালিয়ে দিতে বলল। আমার ইঙ্গিতে তপন পাখাটার গতিবেগ বাড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

—আচ্ছা তপতী, তুমি বইখানা অমনি করে তুলে ফেলে দিলে কেন ? বইটার ওপর অত রাগ কেন ?

—রাগ বই-এর ওপর কেন হতে যাবে ? রাগ আমার বাড়ীওয়ালার ওপর। ওরা আমাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে বাড়ী থেকে তুলে দিতে চায়, অগ্রিম টাকাটা মেরে দেবার মতলব। আমিও দেখতে চাই কিভাবে ওরা আমাদের বাড়ীছাড়া করে ! ও-বলছিল পাড়ার লোকেরা বাড়ীওয়ালার হাতধরা,—তাই না ? একেবারে বাজে কথা। ক্ষুদে, বেন্দা, সান্টু—পাড়ার ডাকসাইটে সব ছেলে কটাকে আমি হাত করেছি। তারা আমাকে এই কালই বলছিল, দাওনা দিদি ফিষ্টির জন্যে ক্লাবকে গোটা কুড়ি টাকা ; ঐ ব্যাটাকে গঙ্গা পার করে খড়দায় রেখে আসি। আমার স্বামী টাকা খরচ করতে চায় না, হাড়কিপটে। দেখুন না, আমার শাড়ীটার তিন জায়গায় রিপু করতে হয়েছে, কিছুতেই শাড়ী কিনে দেবে না। বাচ্চাটার গরম জামা নেই,

শীতে কুঁকড়ে থাকে। আমাকে নিয়ে ট্যাকসি করে কোলকাতায় আসতে বললে আঁতকে ওঠে ; বলে—যাতায়াতে তিরিশ টাকা লেগে যাবে ! খরচ যদি করতে পারবে না, তবে বিয়ে করেছিল কেন ? বিয়ের আগে কত কথা, কত আশ্বাস, কত আদর, কত ভালবাসা। আর এখন শুধু বকুনি আর গালাগালি ; উঠতে বসতে শোনাবে যে আমার চিকিৎসায় ও-একেবারে ফতুর হয়ে গেল। চা ফুরোলে চা কিনবে না, বলবে—আমি একমাসের চা এক সপ্তাহে খরচ করেছি। চিনি ফুরোলে বলবে, আমি সান্টুকে শরবত করে দিয়েছি। তা ঐ ক্ষুদে বেন্দা সান্টুইতো আমার একমাত্র ভরসা এই শত্তুরপুরীতে ওরা ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কে আছে বলুন ? ওরা আছে বলেই বাড়ীওয়ালার গুণ্ডারা আমাকে আর বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারছে না। ওরা যদি চায়, আমি কি না দিয়ে পারি ? এক কাপ চা, এক গেলাস শরবত খাওয়ালে যদি তুমি ফতুর হয়ে যাও তবে বিয়ের আগে অত লম্বা লম্বা কথা বলেছিলে কেন ?

—বিয়ের আগেতো ও জানত না যে তোমাকে বিয়ে করে ওকে বাড়ী ছাড়তে হবে, পরীক্ষা না দিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হবে, দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকতে হবে। ও ভাবতে পারেনি যে তোমার অসুখ করবে, ওষুধ ডাক্তারে মাসে মাসে অতগুলো করে টাকা বেরিয়ে যাবে—

তপতীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, গলার স্বরে অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠল ;

—ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় ডাক্তারবাবু। সকাল আটটায় দুধ এনে বাজার করে শুধু দুটো ভাত আর আলুসেদ্ধ মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ; আর রাত দশটায় বাড়ী ফেরে চাকরী টিউশানী সেরে। খাটতে খাটতে ওর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমাকে বিয়ে না করলে ও রাজার হালে থাকতে পারত !

—এর পর বাড়ী এসে যদি শোনে তোমার সঙ্গে বাড়ীওয়ালার ঝগড়া হয়েছে, তা হলে ওর কষ্ট আরো বেড়ে যায়—তাই নয় কি ?

যদি শোনে তুমি সারা দুপুর ঐসব বাজে ছেলেদের—

—বাড়ীওয়ালাদের ছেলেটা মিথ্যে করে লাগায়। ক্ষুদে সান্টু রা ভাল ছেলে, ওরা থিয়েটার করে চাঁদা তুলে বস্তীর গরীবদের সাহায্য করে, আরো অনেক ভাল কাজ করে ওরা, ভাল ছেলে।

—তোমার মত অল্পবয়সী মেয়ে রোজ যদি ছেলেছোকরাদের বাড়ী ডেকে এনে চা খাওয়ায়, গল্প করে, তাহলে লোকে সেটা ভাল চোখে দেখে না। আমিতো জানি তপন আমাকে বলেছে ওরা খুব ভাল ছেলে ; কিন্তু তোমাদের ছোট শহরে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কেউই পছন্দ করে না। পাড়ার লোকেরা নিন্দে করে, তপনকে কথা শোনায়।

—পাড়ার লোকরা আমার দলে, যা কিছু কুচলিকাটবার সেই অই বাড়ীওয়ালার কাটে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। ওদের ভয়েইতো আমি ক্ষুদে বেন্দাদের ডেকে আনি। ওরা না থাকলে বাড়ীওয়ালা ঠিক আমাদের ঘরে ঢুকে আমাকে অপমান করবে। ও বলে, দরোজা বন্ধ করে ঘুমোবে। আহা, নিজেদের হাতে তৈরী দরোজা ভেঙে ঘরে ঢোকা ভারী যেন একটা শক্ত ব্যাপার। আমার ভয় করে বলেইতো ওদের ডাকি, ওদের ডাকি বলেইতো ওদের চা শরবত খাওয়াতে হয়।

—তপন পুলিশে ডায়েরী করে রেখেছে, বাড়ীওয়ালা তোমাকে কিছু বলতে সাহস পাবে না। তুমি ছেলেগুলোকে আর ডেকে এনো না। কেমন ?

আপনি ঐ কোলকাতায় আমাদের একটা ঘর দেখে দিন, তাহলে আমার আর ভয় করবে না। বাধ্য হয়ে আশ্বাস দিতে হল, মেয়েটা কিছুটা আশ্বস্ত হল। কয়েকটা দিন আমার আশ্বাসের ফলেই হোক আর ওষুধের গুণেই হোক তপন-তপতী শান্তিতে দিন কাটাল। আবার দুসপ্তাহের মধ্যে গোলমাল। স্বামী-স্ত্রী হাজির। একটুকরো কাগজে ঘটনার বিবরণ লিখে তপন আমার হাতে দিল।

কাল অফিস থেকে ফিরে বাড়ির গলিতে ঢুকতেই শোনে যে তপতী তার বাচ্চাটাকে নিয়ে দরোজায় তালা লাগিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। ভারী বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটেছে দুপুরে। সান্টুর সঙ্গে লুডো খেলছিল তপতী, এমনি সময় অন্য ক্লাবের ছেলেরা এসে হল্লা করে; সান্টু পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়ে বেদম প্রহার খায়। কোনোমতে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের ক্লাবে খবর দিতেই ক্ষুদে বেন্দার দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে, দুই ক্লাবের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে; ওদের বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ ভ্যান আসতে রণে ভঙ্গ দিয়ে যোদ্ধারা অন্তর্ধান করে। এবার শুধু বাড়ীওয়ালা নয়, পাড়ার সকলেই প্রায় একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে তপনকে দশ দিনের মধ্যে বাড়ী ছাড়তে হবে; অন্যথায় তাঁরা যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এদের বিবাহপূর্ব ইতিহাস একেবারে মামুলি নয়। তপন অবস্থা-পন্ন ঘরের ছেলে। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে পাড়ার সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজোর পাণ্ডাগিরি করে, উদ্বৃত্ত চাঁদা দিয়ে গানের জলসা বসায়, পাড়ার ক্লাবে নাটকের রিহার্সাল চালায়। চালাক-চতুর ভাল ছেলে বলে পাড়ায় সুনাম ছিল। তপতীরা উদ্বাস্তু এ-পাড়ায় আসার পর থেকেই তপতীর দিকে পাড়ার তরুণদের নজর পড়ে। ওর চেহারা, চলাফেরা, কথাবার্তার মধ্যে পুরুষকে আকৃষ্ট করবার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরুন শুধু ছেলেমহলে নয়, বড়োদের মধ্যেও দস্তুরমত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে তপতী। মফঃস্বলের ছোট শহরে কইয়ে-বলিয়ে মেয়ে খুব বেশি থাকে না। তার ওপর আবার যদি সে সুন্দরী হয় ও নাচতে জানে তবে তাকে নিয়ে তরুণদের মধ্যে মুখরোচক জল্পনা-কল্পনা চলাই স্বাভাবিক। তপতী শহরের অনেক তরুণের ঘুম নষ্ট করল, অনেক কবিতার উৎস হয়ে উঠল, অনেকে ওকে ভালবেসে ফেলল। বলা বাহুল্য তপন তাদের মধ্যে একজন।

তপতীকে ঘিরে যে-স্তাবকের দল গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে সব দিক থেকেই, তপনই শ্রেষ্ঠ। বড়ঘরের ছেলে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, চেহারাও এমন কিছু খারাপ নয়। বহুমুখী প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বরমাল্য গলায় পরার সম্ভাবনার আনন্দে যখন তপন মশগুল, তখন মায়ের মুখে বাড়ীর অভিমত শুনল। চাল নেই, চুলো নেই; উদ্বাস্তু কলোনির অই পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তার বাবা-কাকারা আদৌ রাজী নন। বিয়ে করলে বাড়ী ছাড়তে হবে। কোলকাতার বন্ধুদের উৎসাহে আর নিঃসন্তান মাসীমার অর্থ-সাহায্য পেয়ে বাড়ীর মতামত অগ্রাহ্য করে বেকার তপন তপতীকে বিয়ে করে বসল। বিয়ের পর বছরখানেক ঐ শহরেরই অন্যপ্রান্তে ঘর ভাড়া করে মাসীমার টাকায়, নিজের আংটি ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রী করে বেপরোয়া আনন্দে দিন কাটাল স্বামী-স্ত্রী। বন্ধুদের উৎসাহ ও মাসীমার সাহায্যস্রোতে ভাঁটা পড়তে শুরু করতেই দুজনের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত। ছেলে পড়িয়ে সামান্য যা পেত তার সঙ্গে মা-মাসীর মাঝে মাঝে দেওয়া অর্থ-সাহায্য যোগ করেও আধুনিক ফ্ল্যাটের ভাড়া জোগানো সম্ভব হল না। এর মধ্যে একটা ছোট সওদাগরী আপিসে চাকরী মিলেছে, কিন্তু আবার মায়ের মৃত্যুতে ও-দিককার সাহায্য বন্ধ। একটি বাচ্চা হয়েছে তপতীর, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। বাবা-কাকার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কোনো দিক থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওরা অল্প ভাড়ার বাড়ীতে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। তপতী অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছে; দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, ঘৃণা করে। অনেক প্রেমিকের মধ্যে তপনকে বাছাই করে নিয়েছিল তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার কথা ভেবে। তপতী ভালভাবে বাঁচতে চায়। আগের মত বস্তী বাড়িতে থাকার কথা এখন সে ভাবতেও পারে না। তার মনে হতে লাগল যে তপন তাকে ঠকিয়েছে। আর তপনের প্রেমের নেশা অনেকদিন কেটে গেছে।

আশা করেছিল এম-এতে ভাল করবে, অন্তত বেসরকারী কলেজের মাস্টারী জুটিয়ে পড়াশুনা গবেষণায় মন বসাবে। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যেতে সে চায়নি। প্রেমের জন্যে এত বেশি ত্যাগ করতে হবে জানলে সে বোধহয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামত না। আমাকে খোলাখুলি এত কথা সে বলেনি, কিন্তু আমি তার হাবভাব দেখে এইরকমই অনুমান করেছিলাম।

তপতীকে সে প্রায়ই বলত যে তাকে বিয়ে করে সে যে স্বার্থত্যাগ করেছে তপতী তার মূল্য বোঝে নি, বুঝবেও না।

তপতী ক্রমশ খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে উঠতে লাগল। তপনকে মুখের ওপর কিছু বলত না বটে, কিন্তু তার রাগের ঝাঁঝ গিয়ে পড়ত ঠিকে ঝিয়ের ওপর। বিনাকারণে গালমন্দ কেন সহ্য করবে ঠিকে লোক? সেও সমানে উত্তর দিত। দুজনের চেঁচামেচিতে বাড়ী-ওয়ালা-গিন্নি অতিষ্ঠ হয়ে দুচার কথা বলতে বাধ্য হতেন; আর তার পরই প্রকাশ পেত তপতীর রণচণ্ডী মূর্তি। ভয়ে বাড়ীওয়ালা-গিন্নি পাঁচিলের দরোজা বন্ধ করে দোতলায় উঠে শাসাতেন। তপতী মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে কোলে করে দরোজায় তালা ঝুলিয়ে নিজের মায়ের কাছে চলে যেতে, কখনও বা ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে, মেয়েটাকে কোলে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদত বসত। মাঝে মাঝে চাকরি থেকে ফিরে তপন বাড়ীতে ঢুকতে পেত না—তালা বন্ধ। মাইল দুয়েক ঘুরে শ্বশুরবাড়ী থেকে তপতীকে নিয়ে আসতে হত। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকত। সে-রাত্রে দোকান থেকে পুরী কচুরি কিনে পেট ভরাতে হত। একদিন চরমপত্র জারি করল তপন। এবার যদি এসে সে তপতীকে বাড়ীতে না পায়, তবে সে তপতীকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না। তাকে তার মায়ের কাছেই চিরকাল থাকতে হবে। তপতী ভয় পেয়ে দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করল বটে কিন্তু ঝগড়া বন্ধ করল না। রোজই ঝগড়া করত রোজই ভয় পেত। নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে

পারত না ; বড় বড় দুটো টিনের বাকস টেনে এনে খিলকে জোরদার করত। এই অবস্থায় একদিন জানালার দিকে চোখ পড়তে দেখল সান্টু একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ; চোখাচোখি হতেই চট করে সরে গেল। দেয়ালে টাঙ্গানো আর্শিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সান্টুর অমনি করে তাকিয়ে থাকার কারণ। তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ব্লাউজ টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে জানালাটা পুরো খুলে দিল। পরের দিনও সান্টুকে ঐ অবস্থায় দেখে ওর মনে হল বাড়ীওয়ালার ভয় তাড়াবার উপায় পাওয়া গেছে। দুপুরে দরোজা বন্ধ করা ছেড়ে দিয়ে তখন থেকে সান্টু আর তার দুই বন্ধু ক্ষুদে বেন্দাকে মাঝে মাঝে ঘরে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে লুডো খেলা শুরু করে দিল। তারা চা-পানে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে দিদিকে শোনাতে লাগল—দিদির জন্যে দরকার হলে তার জান দিতে রাজী। পাড়ায় এই নিয়ে প্রথমে গুঞ্জন, পরে কলরব শোনা গেল। ছুটির দিনে তপনের আর বাইরে বেরুবার উপায় রইল না। যেখানে যায় সেখানেই শোনে এই কথা। দু'একদিন লক্ষ্য করল. তার উপস্থিতিতেই শুধু শাড়ী দিয়ে দেহ আবৃত করে—জানালা দিয়ে তপতী সান্টুর দলের সঙ্গে কথা বলছে। ধৈর্যধারণ করতে না পেরে এই সময় থেকে তপতীর গায়ে হাত তুলতে শুরু করল তপন। সান্টুর দলকে শাসিয়ে, স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে এবং মারধোর করেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। সান্টুরা একদিন না এলে তপতী নিজে গিয়ে ওদের আড্ডায় হাজির হত।

এ খবর তপন পেল পাড়ার অন্য ছেলেদের কাছে। বেশির ভাগ সময়েই গায়ে কাপড় দিতে ভুলে যেত তপতী। খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না, রাতের ঘুম বন্ধ। এতদিনে তপনের মনে হল তপতী বোধ হয় অসুস্থ, মানসিক রোগে ভুগছে।....

তপনের লেখা আগের রাতের ঘটনা পড়ে আমি ওকে বাইরে যেতে বললাম। তপতী আগের দিনের মতই চঞ্চল অস্থির ; একগাদা

ছেঁড়া কাগজের প্যাকেট খুলে পড়ার ভঙ্গীতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। বারদুয়েক ডাকার পর সাড়া দিল।

—সান্টুকে তুমি ডেকে এনেছিলে? ছিঃ ছিঃ লোকে কি মনে করছে বলতো!

—সান্টু যদি দরোজায় এসে ধাক্কা মারে কড়া নাড়ে, আমি খুলে না দিয়ে আর কি করতে পারি? খুলে না দিলে বাড়ীওয়ালা গিন্নী দেখতে পেত আর পাড়ার লোক ডেকে এনে দেখাত!

—দিনে দুপুরে ওর এত সাহস হল কি করে? তপন পুলিশের কাছে ডায়েরী করেছে, পাড়ার লোকরা ওদের ওপর নজর রেখেছে—

—আমার খুশী আমি ওকে ডেকে আনব। ওকে ডেকে না আনলে বাড়ীওয়ালারা সেদিন আমার ঘরে আগুন দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারত। তিন লিটার পেট্রল কিনে ওদের রান্না ঘরে জমা করেছে, আমার নিজের চোখে দেখা। আপনি আমার বাবার মত, আপনাকে আমি কত ভক্তি করি; কিন্তু আপনি কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। জানেন ও আমাকে ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে। আপিসে ও বদলী হতে চাইছে; আন্দামানে বদলী হয়ে যাবে। বাচ্চাটাকে ওদের বাপের বাড়ীতে রেখে আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে। সান্টু বলছিল যে পাগলাগারদেও পাঠাতে পারে। তাহলেই ও আর একটা বিয়ে করতে পারে। আমার শরীরে কিচ্ছু নেই. আমাকে ওর মনে ধরছে না, আমাকে ও ভালবাসে না। একবারও আগের মত আদর করে বলে না—আমরা দুজন তপন-তপতী কপোত-কপোতী প্রায়/ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাব চলে নিঃসীম নীলিমায়। আমি যে সুন্দর সে কথা বলতেও ওর আটকায়। সান্টু কিন্তু জানে আমি সুন্দর, হ্যাঁ সান্টু আমাকে বলেছে।...

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। পাশের ঘর থেকে তপন ছুটে এল। আমার কথায় তপনের সান্ত্বনায় কিছুটা শান্ত হয়ে

দেওয়ালের ধারের সোফাটায় গিয়ে বসল; তখনও শিরা বের করা হাত দিয়ে চোখ মুছছে। একটু পরে সোফায় শরীর এলিয়ে ও বোধ-হয় ঘুমিয়েই পড়ল।

তপনকে বললাম: তোমার কিছুদিন ছুটি নেওয়া দরকার। শৈশব থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে তোমার স্ত্রী। আসল ভয় ওর তোমাকে নিয়ে। ওকে বিয়ে করে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তোমাকে তাই ওর ধারণা হয়েছে তুমি ওকে সুযোগ পেলেই পরিত্যাগ করবে। তোমার দুঃখকষ্টের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে; তার ফলে নিজের ওপরে অন্যের ওপরে রেগে যাচ্ছে। তুমিও অর্থাভাব মেটাতে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ; ওর মনে নিরাপত্তাবোধ জাগাতে পারছ না। মানুষ ডোববার আগে তৃণখণ্ড ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে; তপতীও ঐসব পাড়ার বকাটে ছেলেদের আশ্রয় করে সংসার সমুদ্রে কোনোমতে ভেসে থাকতে চাইছে। তোমাকে কে কি বুঝিয়েছে জানি না—তবে আমার মনে হয় না যে ঐসব ছেলেদের সঙ্গে ওর কোনো দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছে। আমি মনে করিনা যে ও 'নিম্‌ফোম্যানিয়ায়' ভুগছে; আমি বিশ্বাস করি না যে 'মরবিড সেক্‌সুয়াল ডিজায়ার' ওকে সাণ্ডু ক্ষুদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ও এক জায়গায় নোঙ্গর ফেলে ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। মনে মনে ও ভাবে ওর শীর্ণ দেহে পুরুষকে আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই, তাইতেই আরো ভয় পেয়েছে, আরো জোর করে তোমাকে আটকে ধরতে চাইছে। বাড়ীওয়ালা ওর সাময়িক আশ্রয়নীড় ভেঙ্গে দিয়ে ওকে নিরাশ্রয় করবে—এই ভয়ে ও অস্থির উন্মাদ হয়ে গেছে। তুমি ছুটি নাও, ওর কাছে কিছুদিন থাক। অন্য কাজ এখন মুলতুবি রাখ।

—কিন্তু আমার তো ছুটি পাওনা নেই। তাছাড়া যাদের পড়াই তাদের অনেকের পরীক্ষা এসে গেছে। ওষুধপত্তর দিয়ে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার।

তপন আমার কথামত ব্যবস্থা করতে পারল না। কয়েকদিন পরে হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল যে আগের দিন তপতী বাচ্চাটাকে কোলে করে ওর অফিসে এসে হাজির হয়; ও তখন অফিসের কাজে বাইরে ছিল। সেখানে সে আবোল তাবোল বকেছে; ওর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মামাকে দিয়ে অফিসের সকলকে তপনকে ছুটি না দেবার জন্য জেলে পাঠাবে বলে শাসিয়েছে। অফিসের বড়সাহেব ওকে হাসপাতালজাত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সব দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তপনকে একটু উল্লসিত মনে হল। এতদিন পরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে বেচারা। চিকিৎসার সব খরচ অফিস থেকেই দেওয়া হবে। হাসপাতালে খাওয়াদাওয়া নিশ্চয়ই ভাল দেবে, ওর শরীরটা হয়ত সারবে। এই কথাগুলো বলে এই প্রথম তপনকে ঈষৎ হাসতে দেখলাম।

তপনের আশা কিন্তু পূর্ণ হল না। সেইদিনই বাড়ী গিয়ে দেখল বাড়ীর সামনে ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে। ত্রস্তপদে বাড়ীতে ঢুকে দেখে বাথরুমের কাপড়জামা রাখার লোহার রডে শাড়ীগলায় তপতীর দেহটা ঝুলছে। বড়সাহেব আর তপনের ইংরেজি কথাবার্তার অর্থ ও বুঝতে পেরেছিল। এটা তার হাসপাতালে না যাবার শেষ চেষ্টা।
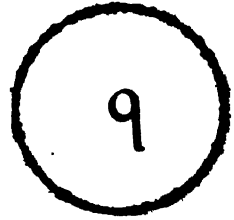
— না ডাক্তারবাবু, আমি যাব না, আপনার এখানে থাকব, আপনি আমার বাবার মত—আমাকে যেতে বলবেন না!

—আহা, তোমাকে তো শ্বশুরবাড়ী যেতে হচ্ছে না, মাসীমার কাছে থাকবে, ভয় কি?

—না ডাক্তারবাবু, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, আমি এখানে থাকব। আপনার মেয়ের সঙ্গে শোবো, আমি আপনার সব কথা শুনব—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

আমার হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল মেয়েটি। বড় বড় চোখ ছুটো তুলে আমার দিকে ভয়ার্ত শিশুর মত তাকিয়ে আমার কাছে আশ্রয় চাইল সাতাশ বছরের মেয়ে অনীতা।

অতি কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে সেদিনকার মত মাসীমার সঙ্গে বাড়ী পাঠালাম। মেসোমশাইকে থাকতে বললাম আলোচনার জন্য।

ওরা বেরিয়ে যেতে মেসোমশাই সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। রকম-সকম দেখে ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন: সারবে তো ডাক্তারবাবু?

—সারবে বলেই তো মনে হয়। আচ্ছা একবার গোড়া থেকে

ব্যাপারটা বলুন তো। কতদিন বিয়ে হয়েছে? ঠিক কবে শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে ·

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন : ঠিক ছত্রিশ দিন হল বিয়ে হয়েছে। ফুলশয্যার পর আসতে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কেমন লাগল, ওরা লোক কেমন, বরকে পছন্দ হয়েছে কিনা, যেমন সবাই করে। তখন অপছন্দ হয়েছে একবারও বলেনি। তারপর কিছুদিন আমাদের কাছ থেকে বরের সঙ্গে চলে গেল তাদের বাড়ী। যাবার সময় নাকি খুবই কান্নাকাটি করেছিল, তা সে তো সব মেয়েই করে থাকে। আমাদের কোনো সময়েই মনে হয়নি যে, ও তিনদিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে একলা পালিয়ে আসবে। এসে অবধি ঐ অবস্থা। কোনো সময় কবিতা বলছে, কোনো সময় নাটক করছে, কোনো সময় ছড়া কাটছে। ওর মাসী তো কেঁদেকেটে অস্থির। দিনরাত খালি কথা বলছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। পাড়ার ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিলেন, ঘণ্টা দুয়েক ঘুম হল। পরের দিন মানে গতকালও ঐ অবস্থা। একদণ্ড এক জায়গায় দাঁড়াবে না, বসবে না। খালি পায়চারী আর বকবক। ভাল কথা বলে দেখলাম, ধমকধামক দিয়ে দেখলাম—কিছুতেই থামানো গেল না। কাল রাতে ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। সেই ঘণ্টা দুয়েক মাত্র বিছানায় শুয়েছিল। নিজে তো ঘুমুবেই না, ওর মাসীকেও ঘুমুতে দেবে না। আমিও দু'রাত জেগে কাটিয়েছি।

—তাহলে তিনদিন আগে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। ওর শ্বশুরবাড়ী থেকে খোঁজখবর করছে না?

—সেইদিনই ওরা ফোন করে জানতে পারে—আমার কাছে এসেছে। ওদের ওখানে থাকতে পাগলামি করেছে বলে মনে হল না। ওদের বলে এসেছে যে মেসোমশায়ের, মানে আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে একবার দেখা করে চলে আসবে। কাল ওর স্বামী এসে ওর অবস্থা দেখে অবাক। নিয়ে গিয়ে ওদের চেনা ডাক্তার দেখাতে চাইল,

আমার স্ত্রী রাজী হলেন না।

—সম্বন্ধ করে বিয়ে, তাই না? সম্বন্ধটা কে এনেছিল?

—আমার ব্যাঙ্কের এক সহকর্মী। তিনি ওদের অনেকদিন ধরেই চেনেন, একই গ্রামের বাসিন্দা। আমিও ছেলে দেখেছি, ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার বেশ ভালই লেগেছে। আমার ব্যাঙ্ক থেকেই টাকা নিয়ে একটা প্রেস করেছে, ভালই চলছে। বড় ভাই বাইরে থাকেন। মা আর ছেলে নিয়ে সংসার। অনীতা সুখেই থাকবে ভেবেছিলাম।

—আপনারাই ওকে মানুষ করেছেন? বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে কতদিন?

—ওর তখন তিন বছর বয়স। দুর্ঘটনায় একসঙ্গে দুজনের মৃত্যু হয়। ওদের ট্যাকসির সঙ্গে একটা বাসের ধাক্কা লেগে ট্যাকসিটা গুঁড়িয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা মারা যান। আশ্চর্যভাবে অনীতা বেঁচে যায়। সেই থেকেই আমাদের কাছেই মানুষ। আমাদের মেয়ে নেই, ওই আমাদের মেয়ে। বছর পাঁচেক আগে প্রাইভেটে বাংলায় এম-এ পাশ করেছে, সেই থেকে আমরা বিয়ের চেষ্টা করছি। এতদিনে যদিওবা বিয়ে দিতে পারলাম, কিন্তু ওকে সুখী করতে পারলাম না।

—আপনি ঠিক জানেন—ওর আগে কোনোদিন এই ধরনের অসুখ হয়নি?

—আপনার কাছে গোপন করতে যাব কেন? ওদের মাতৃকুল-পিতৃকুলেও কারুর মনের রোগের কোনো ইতিহাস নেই। তিন বছর থেকে আমরা মানুষ করছি, আমরা ঠিকই জানি, কস্মিনকালেও ওর এরকম অসুখ হয়নি। আপনি কি বুঝলেন? সারবে তো? শ্বশুরবাড়ী পাঠানো যাবে তো?

—এখনও বিশেষ কিছু বুঝিনি। ওর এখন যা অবস্থা তাতে ওর কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যাবে না। ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়ে যান, দিন সাতেক পরে নিয়ে আসবেন।

সাতদিন পরে অনীতাকে একটু শান্ত মনে হল। চোখ দুটোতে

তখনও কিন্তু ভয়ার্তা ভাব।

—একদম ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিতে এসেছিল, আমি যাইনি। আপনার কাছে আমাকে থাকতে দিন ডাক্তারবাবু—নিচু হয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে চাইল।

কোনক্রমে শান্ত করে একথা-সেকথার পর ওর মুখ থেকে যা শুনলাম, তার সঙ্গে আমার ধারণা কিছুটা মিলল। স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের ভয় ওকে অস্থির করেছে। কিছু কিছু মেয়ের মধ্যে এই ভয় অতিমাত্রায় থাকে। আমাদের দেশে 'ডেটিং' জাতীয় প্রথা এখনও চালু হয়নি। খুব কম মেয়েরই বিয়ের আগে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা থাকে। অনীতা ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়নি। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞ মেয়ে বন্ধুও ওর কেউ নেই। প্রথমে বিয়েতে মত ছিল না। মেসোমশায়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয়, বিয়ের আগে স্বামীকে একবার দেখেছিল—পছন্দ হয়নি, কিন্তু সে কথা লজ্জায় মাসীমার কাছে বলতে পারেনি। ওর মেসোমশায়-মাসীমা নিজের মেয়ের মত আদরযত্নে মানুষ করলেও ওর বাবা-মায়ের অভাব ঠিকমত মেটাতে পারেন নি। ওদের কাছে না চাইতেই যা পেয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। আবদার করে কোনো দিন কোনো কিছু চায়নি, অভিমান বা রাগ করার কোনো উপলক্ষই ঘটেনি। ওর কথা থেকে বোঝা গেল— মেসো-মাসীকে ও ঠিক নিজের বাপ-মায়ের মত কোনোদিনই মনে করতে পারেনি। কয়েক বছর আগেও রোজ রাত্তিরে ও বালিশে মুখ গুঁজে মা-বাবার কথা ভেবে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে। শৈশবের ছোটখাটো স্মৃতির টুকরোগুলো সযত্নে অন্তরের গোপনতম প্রদেশে সুরক্ষিত রেখেছে। ফুলশয্যার দিন অনেক চেষ্টা করেও স্বামী ওর মুখ খোলাতে পারেনি। কিছুটা বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কয়েক বছর পরে সেই রাত্রে আবার ও অঝোরে কেঁদেছে। নিজেকে কেন জানি সে-রাত্রে নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়েছে। জানালা দিয়ে আকাশের

তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোটবেলার মত বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে যে মা আর বাবা সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে তাঁদের অনুর দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ইচ্ছে সত্ত্বেও ওর কাছে আসতে পারছেন না, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। তবুও অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসে, ওঁরা অসহায়—ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারছেন না জেনেও রাগ হয়। আবার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।

সেবারে স্বামী বোধহয় কিছুটা অনুকম্পাভরে আর বেশিদূর অগ্রসর হননি। দ্বিতীয়বার তিনি জোরজবরদস্তি করবেন ভেবে ও ভয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায়নি, এই বোধহয় প্রথম মাসীমার কাছে আব্দার করে আরো কিছুদিন থাকতে চায়। কিন্তু ওর কান্নাকাটিতে কোনো ফল হল না। গাড়ীতেই স্বামীর কাছে তিন দিন সময় চেয়ে নিয়েছিল মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে। স্বামী প্রার্থনা মঞ্জুর করায় কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে যায়। অনেক চেষ্টা করে স্বামীর মাকে মা বলে ডাকে, তিনদিনের মধ্যে সেবাযত্ন করে তাঁর হৃদয় জয় করে। তৃতীয় দিনে কাজে বেরুবার আগে স্বামী ওকে মনে করিয়ে দিল যে, সেই রাত্রে ওদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, দেহের মিলন ওদের মনের মিলনকে মধুময় করে তুলবে। আতঙ্কে অন্তরাত্মা শিউরে উঠলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে অনীতা সম্মতি জানায়। তারপর মেসোমশাই-এর সঙ্গে দেখা করার কথা বলে, শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই ও বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনের মধ্যেই ওর কেমন যেন লাগতে থাকে। ভয়ের পাশাপাশি বুকের মধ্যে আনন্দেরও সাড়া জাগে। কোথায় যেন একটা আনন্দের ঝরনার অনেক দিনের বন্ধ মুখ খুলে গেছে মনে হয়। প্রথমে গুণ গুণ করে, তারপর একটু উঁচু গলাতেই গান ধরে, আশেপাশের লোকজন ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনে হয়। ও গ্রাহ্য করে না, আরো উঁচু গলায় গান ধরে। শিয়ালদা স্টেশনে ওকে ঘিরে ছোটখাটো একটা

ভিড় জমে যায়। ও রেগে গিয়ে তাদের যা-তা বলে তিরস্কার করে। এমনি সময়ে মেসোমশায়ের এক বন্ধু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করেন, সব কথা ওর মনে নেই। তারপর তিনি অনেক কষ্টে পুলিশের সাহায্য নিয়ে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, এইটুকু শুধু ওর মনে আছে।

—তুমি স্বামীকে ভয় পাচ্ছ কেন? যতদূর শুনলাম সে তো খুবই বিবেচক। তোমার সঙ্গে এ পর্যন্ত কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। বিয়ে যে কালে হয়েছে শ্বশুরবাড়ী যেতেই তো হবে।

—না, আমার ভয় করে। আমি আপনার বাড়ীতে থাকব। রান্নাবান্না করব, বাসন মাজব, আপনার সব কথা শুনব। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমাকে থাকতে দিন। আপনাকে অনেকটা আমার বাবার মত দেখতে।

—তোমার স্বামীর মত না নিয়ে তো তোমাকে রাখা যায় না; সেটা বে-আইনী হবে। সে আমার নামে মামলা ঠুকে দিতে পারে........

—সে কিছু বলবে না, সে খুব ভাল মানুষ। আর তার সঙ্গে তো আমার আসল বিয়ে এখনো হয়নি। আমি ওদের বাড়ী গেলে মরে যাব। আমার ঘুম হবে না, খিদে হবে না। আমি কাজ করতে পারব না; তখন ওরা আমায় বকবে, মারবে মেরে ফেলবে।

—এখনই তো আর যেতে বলছি না। কাল তোমার স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাকে বলে দেব যে দু'সপ্তাহ পরে তুমি ওদের ওখানে যাবে। এর মধ্যে তোমার ঘুম হবে শরীর ভাল হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ না হলে তো আর তোমাকে যেতে বলছি না।

—না আমি কোনোদিন সুস্থ হব না। মেসোমশাই জোর করে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে ওরা আমাকে যন্ত্রণা দেবে, আমাকে সিঁড়ির ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখবে। ওরা ভাবছে আমাকে ভূতে পেয়েছে। রোজা ডেকে আমাকে কাঁটাতারের বেত দিয়ে মারবে। আমার খুব লাগবে। না, আমি যাব না—বলে কেঁদে

উঠল অনীতা।

পাশের ঘরে মেসোমশাই আর মাসীমা ছিলেন। মাসীমার জিম্মায় অনীতাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। মাসীমাকে বেশ ভয় পায় মনে হল। তিনি ডাকতেই একবার করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

মেসোমশায় চিন্তান্বিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: খুব মুস্কিল হয়েছে ডাক্তারবাবু। কাল জামাইবাবাজী বেশ মেজাজ দেখিয়ে গেলেন।

—কি বলছে? অসুখ সারলেও ওকে গ্রহণ করবে না।

—শুধু তাই নয়। আমার নামে মামলা করবে বলে শাসিয়ে গেছে। আমি নাকি জেনেশুনে একটা উচ্ছিষ্ট মেয়েকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি।

—উচ্ছিষ্ট? ওঃ। ওর বুঝি ধারণা হয়েছে যে অনীতা অন্য কাউকে ভালবাসে বলে শ্বশুর ঘর করতে চাইছে না।

- হ্যাঁ, আর এই ধারণা মেয়েটাই কাল দুপুরে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—প্রেমিকের পরিচয় কিছু পেয়েছেন?

—না, ওর মাসী অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে পারেন নি। তবে স্বীকার করেছে যে সে ঐ ধরনের কথা জামাইকে বলেছে। আচ্ছা, এ নিয়ে কি মামলা হয়?

—উকিলরা বলতে পারে। তবে আমি ওর কথার কোনো মূল্য দিতে রাজী নই। মনে হয়, ও স্বামী-সঙ্গ এড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে তাকে একটা কাহিনী তৈরী করে শুনিয়েছে।

—স্বামী কি বাঘ না ভাল্লুক যে তার সঙ্গ এড়াবার জন্য নিজের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাতে যাবে! আপনি কি মনে করছেন বলুন। ও-কিন্তু আপনাকেও অনেক মিথ্যে কথা বলছে। ওর মাসী বলছেন, ওর ঘুম হচ্ছে; খাওয়া-দাওয়াও করছে; অথচ ও আপনার কাছে

বলে চলেছে যে ওর ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না। আমার মনে হয়; ও অসুখের ভান করছে।

—ভান করে ওর লাভ ?

—সেইটেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। এক লাভ, এখানে থাকলে যাকে ও ভালবাসে, তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু এই কেলেঙ্কারীর পর ওকে আমরা এ-বাড়ীতে কি করে রাখব ভেবে পাচ্ছি না। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।....

—আচ্ছা যদি প্রেমট্রেম সত্যিই করে থাকে, আপনারা কিছুই বুঝতে পারলেন না; জানতে পারলেন না; -এ কি হয় ? প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেখেন নি, কোনোদিন কারুর কাছে ওর নামে গুজব শোনেন নি; রাত করে কোনোদিন বাড়ীতে ফেরেনি;-- এসব কথাতো আপনিই বলেছেন। ঠিক কিনা ?

একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক মুখ নীচু করলেন; একটু লজ্জা পেয়েছেন মনে হল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। নিজের মেয়েকে--ওকে নিজের মেয়ে মনে করেই এসেছি আমরা; খারাপ ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল। বিপদে পড়লে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয়। না; চব্বিশ বছর ধরে ওকে দেখছি; ও-নিজের মুখে বললেও ঐ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। বুঝতে পারছি আপনার কথাই ঠিক। ও প্রলাপ বকছে। আচ্ছা; এ রোগটা কি ডাক্তারবাবু ?

- রোগটা এক ধরনের পাগলামি। ডাক্তাররা নাম দিয়েছেন—'হানিমুন সাইকোসিস।' 'হানিমুন'কে বাংলায় যেন কি বলে ? মধুচন্দ্রিমা তাই না ? আর 'সাইকোসিস' মানে উন্মত্ততা, পাগলামি। আপনা থেকেই বেশিরভাগ রোগী ভাল হয়ে যায়। তবে আপনাদের অনীতার অসুখের মধ্যে বোধহয় আরো একটু জটিলতা আছে। ও স্বামীকে যে কাহিনী শুনিয়েছে, সেটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। দেখতে হবে কাহিনীটা নিছক স্বামীকে তাড়াবার মতলবে ওর

মাথায় গজিয়েছে, না কল্পিত কাহিনীটি ওর ভ্রান্তি এবং অমূলদর্শনের (delusion and hallucination) নিদর্শন। ওঁকে বিদায় দিয়ে অনীতাকে ডাকলাম। তাকে বললাম,—তুমি আমাকে বাবার মত মনে কর; অথচ স্বামীকে যা বলেছ আমার কাছে সেকথা গোপন করেছ। তুমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাও বুঝলাম। কিন্তু নিজের মাথায় মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা না চাপিয়েও তো স্বামীর থেকে আলাদা হতে পারতে। অনীতা একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল: মিথ্যে কেন হবে? আমি যা বলেছি তা সত্যি। জল্লেশদাকে আমি ভালবাসি। তিনিও আমাকে ভালবাসেন। তিনি কত সুন্দর কত ভাল। আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।

– একথা বিয়ের আগে মাসীমা-মেসোমশাইকে বলনি কেন? তাহলে তাঁরা তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন. এই বিয়েটা ঘটত না: আমার কাছে একবারও ঐ জল্লেশদার নাম করোনি। কেন?

—আপনারা গুরুজন। গুরুজনের কাছে কি এসব কথা বলা যায়? তাছাড়া জল্লেশদার সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? তাঁর অনেকদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর মেয়ে এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিচ্ছে।

– তুমি এসব জেনেশুনে তাঁকে ভালবেসেছ, না তিনি খবরগুলো গোপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল কোথায়? আলাপ হল কি করে?

—তিনি গোপন করার মত মানুষ নন। আমি সব জানতাম তিনিই আমাকে বলেছেন। তাঁর বৌয়ের কথা মেয়ের কথা তাঁর ছোটবেলার কথা। আলাপ হয়েছে তাঁর দোকানে উল কিনতে গিয়ে। চুলের ফিতে সেফটিপিন উল পাউডার তেল সাবানের মস্তবড় দোকান আছে তাঁর। দোকানে ঢুকলেই ভারী সুন্দর একটা গন্ধ পেতাম, আমার খুব ভাল লাগত। যেমন সুন্দর জল্লেশদা তেমনি সুন্দর তাঁর দোকানের গন্ধ। শুধু দামী পাউডার সেন্ট মিশোলেই

আপনি ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারবেন না। সবাই ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারে না। আরো কত সেণ্ট পাউডারের দোকান আছে তো ষ্টেশনের ধারে ; কোথাও ঐ গন্ধ আপনি পাবেন না। ঐ গন্ধ প্রথম যেদিন নাকে যায় সেইদিনই মনে হল এ গন্ধ আমার চেনা খুব চেনা। আমার মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ধারে গেলে ছোটবেলায় ঐ গন্ধ পেতাম। যেদিন আমরা গাড়ী করে বিয়েবাড়ী যাচ্ছিলাম যেদিন বাসের ধাক্কায় আমাদের গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায় ; সেদিন মায়ের গায়ে আমার ফ্রকে ঐ সেণ্ট ঐ পাউডারের গন্ধ ছিল। জল্লেশদার দোকানে ঐ গন্ধ পাবার পর রোজ একবার করে তাঁর দোকানে যেতাম ঐ গন্ধ শুঁকতে। দুপুরবেলায় মাসী ঘুমিয়ে পড়ত। আমি খিড়কির দরজা দিয়ে জল্লেশদার দোকানে যেতাম। তখন খদ্দের থাকত না, শুধু আমি আর জল্লেশদা। কত আদর করতেন আমাকে জল্লেশদা। লজেন্স দিতেন, টফি দিতেন, তাঁর বাবা-মার গল্প করতেন। ওঁরও খুব অল্পবয়সে মা-বাবা একসঙ্গে মারা যায়। আমরা দুজনে একইরকম ; একই গন্ধ ভালবাসি, একই গান ভালবাসি, একই রঙ ভালবাসি···· এসব কথার একটাও মিথ্যে নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, দারুণ ভালবাসি। আমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পারি।... আমাকে আপনি আপনার বাড়ীতে থাকতে দেবেন তো ? জল্লেশদা বেঁচে থাকলে কি আপনাকে এত বলতাম। আপনি আমার বাবার মত, আমি আপনার সব কাজ করব ; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

সব শুনতে মেসোমশায়ের মনে পড়ল জল্লেশদার কথা। ওঁর বাড়ীর উল্টোদিকে একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকানের মালিক জল্লেশদার দোকানে সত্যিই অনীতা রোজই গিয়ে গল্প করত, তাঁর কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট আদায় করত। ওর যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। সেই সময়ই জল্লেশবাবুর মৃত্যু হয়। দোকানটাও উঠে যায়। তখন জল্লেশদার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

অনীতার স্বামী লোক ভাল। তাকে সব বুঝিয়ে দিতে খুব বেগ পেতে হয়নি। জল্লেশদার কাহিনী শোনার দিন পনেরোর মধ্যে অনীতার ভ্রান্তি কেটে যায়। স্বামীর ঘরে যেতে তখন আর আপত্তি হল না তার।
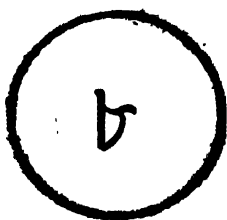
—মায়ের চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভাল, সত্যিকারের রূপসী বলা চলে মাকে। মায়ের পাশে দাঁড়ালে ছেলেরা আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না, মাকেই দেখতে থাকবে। হ্যাঁ মনে হবে আমার বোন খুব জোর বছর চার-পাঁচেকের বড়। অপরিচিত কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে সঙ্গীত সমাজের পরিচালিকা শান্তিদেবীর আমার বয়সী মেয়ে থাকতে পারে। আমাদের ছোট শহরের অনেকেই জানে না শান্তিদেবীর মেয়ে আছে। দশ বছর বয়স থেকে আমি কলকাতার এক স্কুল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা, সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার আগে মায়ের কাছে গেছি মাত্র দুবার,—তাও দিন তিনেকের জন্য। গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা কলকাতায় আসতেন সান্তু মামাকে নিয়ে। হয় আমরা তিনজন ছুটিতে কোনো জায়গায় বেড়াতে যেতাম, না হয় মা আমার সঙ্গে কলকাতার কোন হোটেলে ছুটিটা কাটিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। আমার জন্মস্থান প্রায় আমি ভুলতেই বসে-ছিলাম। স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার পর আমি মাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাক্স বিছানা নিয়ে, সোজা গিয়ে দেশের বাড়ীতে হাজির হলাম। এখন ভাবি না গেলেই বোধহয় ভাল ছিল।

এই অবধি বলেই মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মনে হল, অন্য কিছু ভাবছে বা শুনছে। ওর স্বামীর কাছ থেকে জেনেছিলাম মাঝে মাঝে একটা বাজনার শব্দ কানে আসে, আর তারপরই মেয়েটির সারা দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। পাশের চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বামী ওর কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিলেন, ওর নাম ধরে ডাকলেন, মেয়েটি সাড়া দিল না। ওর চোখ দুটো তখন সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ, পলক পড়ছে না। সারা শরীর শক্ত আর ভারী হয়ে গেছে— ওর হাত ধরে আকর্ষণ করতেই সেটা বোঝা গেল। স্বামী ইঙ্গিতে জানালেন, জয়ার ফিট হয়েছে। এখন কিছুক্ষণ ওর এই অবস্থা চলবে। দেহ কঠিন হয়ে থাকবে, চোখ দুটো ঐ দেওয়ালে আটকে থাকবে, ডাকে সাড়া দেবে না কথা বলবে না, মাথা নাড়বে না। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলে ক্যাটালেপসি।

জয়ার অসুখ বেশ পুরনো। পাঁচ বছরের মধ্যে দুবার নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছে, প্রথমবার মাস তিনেক, দ্বিতীয়বার মাসখানেক। আগের তুলনায় এখন বেশ কিছুটা ভাল আছে, কিন্তু অসুখটা পুরো-পুরি সারছে না। প্রতি বছর এই পুজোর সময় অসুখ বাড়ে। কাজ কর্মে অনিচ্ছা, স্নানাহারে অরুচি, সব সময় অস্থিরতা, কথা বার্তা কমে যায়, ঘুম একেবারে হয় না,—আরো অনেক কিছুর একটা ছোটো-খাটো ফিরিস্তি দিলেন ওর স্বামী প্রবীরবাবু। মফঃস্বলের একটা স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক এই প্রবীরবাবু। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা, বক্তব্য অল্প কথায় গুছিয়ে বলতে পারেন, দেখে মনে হয় বেশ রুচিবান ও বুদ্ধিমান। তাঁর মুখে শুনলাম এই 'ক্যাটলেপটিক ফিট'টা আগে ছিল না, বছর দুয়েক হল হচ্ছে। এই ফিট হবার আগে জয়া একটা গান শুনতে পায়, কথাগুলো বুঝতে পারে না, কিন্তু সুরটা খুবই পরিচিত মনে হয়—যেন আগে কোথাও শুনেছে। নতুন উপসর্গ হবার পর ওকে আর কিছুতেই নার্সিং-হোমে পাঠান যাচ্ছে না, ওষুধও খেতে চাইছে না। বারবার স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলছে। ওর

ধারণা এ অসুখ কোনদিনই সারবে না। প্রবীরবাবুর জীবনটাকেও নষ্ট করে দিতে চায় না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর মার কাছে ফিরে যাবে জয়া। সেখানেও সুখে থাকবে না ঠিকই, কিন্তু প্রবীরবাবু তো এই চিররুগ্ন স্ত্রীর ভার বহনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

—কিন্তু আমি জানি মার কাছে জয়া থাকতে পারবে না, কিছুদিন থাকার পর হয় পালাবে কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। মায়ের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি ওকে বিয়ে করি।

আমার নির্দেশে প্রবীরবাবু জয়ার জীবন-ইতিহাস খুলে বললেন।

ছোটনাগপুরের একটা ছোট শহরে জয়ার বাড়ী। বাড়ীটা ওর মাতামহের ছিল, বর্তমানে মায়ের অধিকারে। জয়ার মা অবাঙ্গালী খৃষ্টান। ডাকসাইটে সুন্দরী, গানবাজনায়ও খুব নাম। কয়েক বছর হল বাড়ীতেই একটা গানের স্কুল খুলেছেন, স্কুলটা ভালই চলছে। বছর পঁচিশেক আগে জয়ার বাবা একটা অভ্রখনিতে চাকরি নিয়ে ঐ শহরে আসেন, তাঁরও গানবাজনার খুব শখ ছিল। সেই সূত্রে জয়ার মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, পরে বিবাহ হয় মাস ছয়েকের মধ্যে। জয়ার বাবা বাঙ্গালী হিন্দু, বিবাহটা তাই শাস্ত্রমতে হয়নি। বিবাহের পর দশ বছর ওঁরা কোন মতে বিবাহবন্ধনটা টিকিয়ে রেখে-ছিলেন। শুনেছি, রোজই ওঁদের মধ্যে খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল। ইতিমধ্যে জয়ার বাবার মৃত্যু হয়েছে, জয়ার বাবা যে কোম্পানীতে কাজ করতেন, সেই কোম্পানীও লালবাতি জ্বেলেছে। জয়ার বাবা বাধ্য হয়ে নিজের বাসা তুলে দিয়ে স্ত্রীর বাড়ীতে এসে উঠেছেন। তাঁর জমান টাকা ছিল না, কাজেই খাওয়াপরার জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জয়ার দাদামশাই বেশ মোটারকমের ব্যাঙ্কব্যালান্স রেখে যান, জয়ার মা-ই তাঁর একমাত্র সন্তান। সবদিক থেকেই জয়ার মার মুক্ত জীবন যাপনের সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি কোন সময়েই দ্বিধা করেন নি। এ অবস্থায় যা হবার তাই হল। জয়ার বয়স যখন ৮।৯ বছর, তখন ওর বাবা-মায়ের

মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। বাবা ঐ শহর ছেড়ে চলে গেলেন, তখন থেকে জয়া তাঁর কোন খবর জানে না। জয়ার মা বলেন কুম্ভমেলায় ভিড়ের চাপে তিনি মারা গেছেন—এ খবর তিনি নাকি নির্ভরযোগ্যসূত্রে পেয়েছেন। জয়াও এতদিন তাই বিশ্বাস করে এসেছে। বছরদুয়েক আগে মায়ের বাকসে একটা চিঠি পায়, সেটা পড়ে বুঝতে পারে বাবার মৃত্যু-সংবাদটা বানান। তখন থেকেই ঐ গান শুনছে আর ঐ রকম ফিট হচ্ছে।

—আপনার সঙ্গে জয়ার কি করে পরিচয় হল ?

—কোলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ও বাড়ী চলে আসে, ওর মুখেই শুনেছেন। সেও প্রায় বছর-ছয়েক হতে চলল ! সেই সময়ে আমি ওখানকার খৃষ্টান মিশনের স্কুলে চাকরী পাই। ঐ স্কুলটা বলতে গেলে জয়ার দাদুর ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। তিনি কিছু টাকাও স্কুলের জন্য রেখে যান। স্কুলে জয়ার মায়ের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। জয়া কলকাতা থেকে ফিরে এসে স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেয়। সেই সময় থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। স্কুলটা ও জয়াদের বাড়ী শহরের বাঙ্গালী পল্লী থেকে বেশ কিছুটা দূরে শহরের একপ্রান্তে। জয়ার মায়ের গানের স্কুলে কিছু বাঙ্গালী মেয়ে গান শিখতে আসত বটে, কিন্তু শহরের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে ওঁর মেলামেশা ছিল না। হাঁা, ঠিকই অনুমান করেছেন। ওঁর স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ইত্যাদির জন্যই বোধহয় ওঁর নামে বদনাম রটেছিল। জয়া বাড়ী ফিরে এসে সেটা জানতে পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিল। স্কুলের দু-একজন বৃদ্ধ পাদরী শিক্ষক ও আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশত না। আমার সঙ্গে ক্রমশ হৃদ্যতা জন্মাল। আমাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে চা খাওয়াত গান শোনাত বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করত। মাঝে মাঝে ওর মা এসে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন, তবে বেশিক্ষণ থাকতেন না। পুজোর ছুটি হয়েছে, কলকাতায় যাব বলে গোছগাছ

করছি, এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে জয়াদের বাচ্চা চাকরটা একটা চিরকুট নিয়ে উপস্থিত। জয়ার মা জানিয়েছেন, জয়ার অবস্থা খুব খারাপ, এখুনি ডাক্তার নিয়ে যেন চলে আসি। দিন দুয়েক আগেও ওদের বাড়ীতে এক গানের মজলিশে উপস্থিত ছিলাম, তখন জয়াকে সুস্থ দেখেছি। এর মধ্যে এমন কি হল যে অবিলম্বে ডাক্তার দরকার? ছেলেটার কাছে শুনলাম জয়াদিদির হুঁস নেই, খুব শক্ত-ধরনের কিছু অসুখ করেছে। মিশনের ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখি, জয়ার মা আর গানের স্কুলের অন্য একজন শিক্ষক জয়াকে ধরে ধরে হাঁটাবার চেষ্টা করছেন। জয়ার চোখ বন্ধ, চুল খোলা, কাপড়চোপড় ভেজা। শোনা গেল জয়া আফিম খেয়েছে। ডাক্তারবাবু বেশ অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার ফল বললেন, এখন আর ভয়ের কিছু নেই বমির সঙ্গে বোধহয় বেশির ভাগ আফিম বেরিয়ে গেছে। এখন ঘুমুলেই ভাল হয়ে উঠবে। ওষুধপত্র কখন কি দিতে হয়ে শিক্ষক ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু উঠলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

—জয়া বিষ খেল কেন জানতে পেরেছিলেন?

— পরের দিন জয়ার কাছেই সব শুনলাম ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। জয়া আমাকে ছাড়তে চাইল না। বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে দিলাম, ওখানেই থেকে যেতে হল।

জ্ঞান হবার পর জয়াই সেদিনকার ঘটনা এবং আরো অনেক কিছু বেশ গুছিয়ে বলল:

বাড়ীতে এসেই বুঝলাম মা আমাকে কাছে পেয়ে একটুও খুসী হতে পারেননি। আমাকে বারবার কোলকাতায় ফিরে যেতে বললেন। আমারও কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল, আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। সময় কাটছে না দেখে স্কুলে পড়ানোর ভার নিলাম। সেখানে প্রবীরের সঙ্গে পরিচয় হল, ওকে প্রথমদিন দেখেই ভাল লাগল। দু-চারদিনের মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে নানা রকমের

কথা কানে আসতে লাগল। দু-একটা উড়ো চিঠি হাতে এল। মা আর মার্গ সঙ্গীতের শিক্ষক ভার্গবজীকে নিয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথা লেখা ছিল চিঠিতে। ভার্গবজী এসেছেন মাস কয়েক আগে। বাড়ী রামপুর। কিছুদিন আগে লক্ষ্ণৌ-এর এক জলসায় ভার্গবজীর গান শুনে মার খুব ভাল লাগে। তাঁর অনুরোধে আমাদের স্কুলে এসে যোগদান করেন। এসব কথা মায়ের কাছে শোনা। আমি ঐসব চিঠিপত্র বা গুজবে প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি বটে, কিন্তু মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে সন্দেহ ঢুকল। গান শেখার সময় মা ভার্গজীকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না। মাকে কিছু বলতেও লজ্জা করত। মনের শান্তি ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেল। এ নিয়ে প্রবীরের সঙ্গে আলোচনা করব ঠিক করলাম, কিন্তু কিছুতেই কথাটা তুলতে পারলাম না। নিজের মাকে নিয়ে—ছিঃ। এমনি সময় পুজোর ছুটি এসে গেল। প্রবীর চলে যাবে, কথা বলার গল্প করবার কেউ থাকবে না,—এইসব চিন্তা মনে নিয়ে একদিন হাঁটতে হাঁটতে বড় সড়ক ধরে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল। আউট-হাউসের কাছে একটা রিকসা দেখলাম। রাত তখন নটা। এত রাত্রে কে আবার এল? ভাবতে ভাবতে বসবার ঘর দিয়ে মায়ের ঘরের সামনে এসে দেখি দরজাটা বন্ধ। মা কি তবে অতিথির সঙ্গে শোবার ঘরে বসে কথা বলছেন? বাচ্চা ছেলেটা, রান্নার মেয়েটা কাউকেই ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। এত রাত্রে দরজা খোলা রেখে ওরা কোথায় গেল? এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, এমনি সময় দরজার খিল খোলার শব্দ শুনলাম। তার পর যে দৃশ্য দেখলাম তা আপনাকে আমি বলতে পারব না। কয়েক সেকেণ্ড বোধ হয় আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম, কথা বলার শক্তিও আমার ছিল না। ভার্গবজী দ্রুত পায়ে আমার পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে গেলেন। মা বেশবাস ঠিক করতে করতে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার লজ্জা

করে না জয়া ছিঃ। মায়ের ঘরের দরজায় আড়ি পাততে এসেছ। ছিঃ।' তাঁর কথাগুলো জড়ানো, মা নিয়মিত আফিম খেতেন, বুঝলাম আফিমের মাত্রা আজ একটু বেশি হয়েছে। মা বাথরুমে গিয়ে দরজা দিলেন। আমি এর মধ্যেই, কি করব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। মায়ের আফিমের কৌটো কোথায় থাকে আমি জানতাম। কৌটো থেকে সবটা আফিম নিয়ে এক গেলাস জলের সাহায্যে আফিমের ডেলাটা পেটের মধ্যে চালান করে দিলাম। পেটের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হল, গা গুলিয়ে উঠল, নিজের ঘরে ঢোকবার আগেই মুখ নাক দিয়ে একগাদা তেতো টক জল বেরিয়ে এল। মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে দেখলাম প্রবীর পাশে বসে। আমার জন্যে সেবার ওর পুজোর ছুটিতে কোলকাতা যাওয়া হল না।

পরের ঘটনাগুলো কিছুটা প্রবীরবাবু, কিছুটা জয়ার কাছে শোনা। একদিনে নয়, চার পাঁচদিনে টুকরো টুকরো শুনেছি। পাঠকদের সুবিধের জন্য গুছিয়ে একসঙ্গে পরিবেশন করছি।

জয়ার কাছে আফিম খাওয়ার ইতিহাস শোনার পর প্রবীরবাবু ওকে কোলকাতায় গিয়ে কলেজে ভরতি হবার জন্যে তোড়জোর করতে বলেন। জয়া রাজী হয় না। ওর ধারণা ও চলে গেলে মা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে যাবেন, আরো কুৎসা রটবে, এ শহরে ও আর মুখ দেখাতে পারবে না। মাকে যেমন করে হোক এই পথ থেকে ফেরাতে হবে। সেই দিনের পর দরজা বন্ধ করে সঙ্গীতচর্চা কয়েকদিন মাত্র বন্ধ ছিল। পরে নিয়মিতভাবে রোজ দুপুরে মায়ের ঘরে ঘণ্টা দুয়েক ধরে খেয়াল ধ্রুপদের নিঃশব্দ আলাপন সুরু হল। জয়া স্কুল ছেড়ে রোজ দুপুরে বাড়ীতে থাকা আরম্ভ করল; কিন্তু সঙ্গীতরসের ফল্গুধারা বয়েই চলল। জয়ার চোখের সামনেই এখন দুপুরে দরজা বন্ধ হতে লাগল। প্রবীর জয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করত, অনেক করে বোঝাত; কিন্তু কিছুতেই তাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী করাতে পারল না। বিরক্ত হয়ে ও দেখা সাক্ষাৎ এক রকম

বন্ধ করেই দিল। জয়ার মাথায় ইতিমধ্যে নতুন মতলব গজিয়েছে। সে ভার্গবের কাছে মার্গসঙ্গীত চর্চা সুরু করেছে। সঙ্গীত স্কুলের ছুটি হবার পর সে গান শেখার জন্য ভার্গবকে আটকে রাখতে সুরু করল ; ভার্গবের মনকে সঙ্গীতসাধনা দিয়ে জয় করার সংকল্প নিয়ে জয়া উঠে পড়ে লাগল। ভার্গবের সঙ্গীতপ্রীতির মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না। তরুণী শিষ্যার সাধনাকে সফল করাতে সব রকম সাহায্য করতে রাজী হলেন। চল্লিশোর্ধা মায়ের চেয়ে কন্যাকে তিনি বেশি উপযুক্ত শিষ্যা মনে করলেন। মায়েরও এক এক সময় মেয়ের কণ্ঠে রাগ-রাগিণীর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা দেখে মনে হত, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে জয়া একদিন ভারত-বিখ্যাত হতে পারে। গানের প্রতি সহজাত আকর্ষণ থাকার দরুন দুপুরে ভার্গব-সঙ্গ বঞ্চিত হয়েও মা কন্যার ওপর রুষ্ট হতে পারলেন না। কিছুদিন এই রকম চলার পর তিনদিনের জন্য একটা কাজে মাকে জেলাশহরে যেতে হয়। সেই সময় দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ও তখন থেকে জয়ার রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সন্ধ্যায় একটা খুব শক্ত ও সূক্ষ্ম কাজ আয়ত্ত করতে পেরে ভার্গবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বন্যায় জয়া ভেসে অন্য এক জগতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে শুধু কিন্নর কিন্নরীর মেলা, আর সঙ্গীতের জাদুখেলা। ভার্গবের অনুরোধে এই সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠানকে আরো আনন্দময় করে তুলতে জয়া এক গেলাস সিদ্ধির শরবত পান করেছিল। সিদ্ধির নেশা সঙ্গীতের নেশাকে আরো তীব্র করে তুলল। সুর তাল মূর্ছনা সব মিলে এক মাদকতাময় পরিবেশ তৈরী হল। জয়ার কণ্ঠ নীরব, কিন্তু কানে কিন্নরলোকের সঙ্গীত ভেসে আসছে ; চোখ বোজা, কিন্তু চোখের সামনে বৃন্দাবনে গোপিকাদের মিলন দৃশ্য ফুটে উঠছে ; পারিজাতের গন্ধে ওর মন মাতাল হয়ে উঠেছে। এই সিদ্ধিলাভের জন্য গুরুদেবকে কি দক্ষিণা দিতে পারে সে ? গুরুদেব যা চাইবেন তাই দিতে সে রাজী। ভোরে ঘুম ভাঙতে, নেশা কাটতে জয়া বুঝতে পারল গুরুদেবকে সে এমন সম্পদ দিয়ে বসে আছে, যে আর

তার এই জগতে থাকা চলে না।

এবার প্রবীরবাবুর জবানবন্দীতে শুনুন।

—প্রথমে মিশন হাসপাতাল, সেখান থেকে জেলা হাসপাতাল। প্রাণের আশঙ্কা চলে গেল, কিন্তু মনের রোগ ধরা পড়ল। কোলকাতায় পাঠান হল। মনের ডাক্তাররা বললেন—স্কিজোফেনিয়া। তিন মাস নার্সিং হোমের চিকিৎসার পর বাড়ীতে আনা হল। আগেই বলেছি পুরো ভাল হল না। আরো একবার নার্সিংহোমে যেতে হল। ওর মা কতটা জেনেছিলেন বলতে পারি না। ভার্গবের সঙ্গে মেলামেশায় ওঁর আপত্তি দেখলাম না। কাজেই আবার বিপদ ঘটল। এক সন্ধ্যায় একটা সুটকেসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আমার কাছে এসে ট্রেনে তুলে দিতে অনুরোধ জানাল। কোথায় যাবে জানে না, কোথায় থাকবে জানে না। শুধু এইটুকু জানে এখানে সে থাকবে না। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, এবার সুযোগ পেয়ে প্রস্তাব করলাম। ও রাজী হল। ওর মাকে 'খুসী মা' হয়েও মত দিতে হল; মিশনের যাজকদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার উপায় ওঁর ছিল না। আপনি অত বিস্মিত হচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু! এরকম ঘটে না? আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল, ওকে বিয়ে করে, ভালবেসে ওকে আমি সারিয়ে তুলতে পারব। সেরে প্রায় উঠেওছিল। বিয়ের পর বেশ ভালই ছিল। আমরা আলাদা জায়গায় বাসা নিয়েছি। মায়ের সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, সে ব্যবস্থাও সাধ্যমত করেছি। কিন্তু বছর দুয়েক আগে মায়ের একটা বড় দরের অসুখ করে, ওকে দেখতে চান। দিন চারেক গিয়ে মায়ের কাছে থাকে। সেই সময় একটা পুরনো বাকসে একখানা চিঠি দেখে। ওর বাবা মাকে লিখেছেন। তা থেকে বুঝতে পারে কুম্ভমেলার গল্পটা বানানো। তখন থেকে ঐ গান শুনছে আর ফিট হচ্ছে। বছরে মাস দুয়েক পুজোর সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অসুস্থ থাকে; তারপর আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই জয়ার কাছ থেকে জানতে পারি ওর বাবা কি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: জয়ার বিয়ের খবর পেয়ে তিনি খুসী হয়েছেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর কন্যার রক্তে মায়ের রক্তের ভাগ কম ; সে মায়ের মত সঙ্গীতের নেশায় মত্ত হয়ে স্বামী ও সন্তানকে অবহেলা করবে না, উন্মার্গগামী হবে না। আরো জানতে পারি যে গানের সুর শুনে ওর ফিট হয় সে সুর ভার্গবজীব কণ্ঠে শুনেছিল সেই মাদকতাময় সন্ধ্যায়।
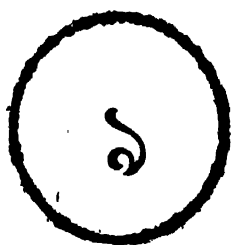
Only a wise man knows how to love (Seneca) —'আমি ভালবাসতে জানি না, ভালবাসতে শিখিনি। আমি কোনোদিনই আমার স্ত্রীকে ভালবাসিনি। না, আমি ভালবাসতে চাই না। ভালবাসতে শিখতে হয়, এই বয়সে নতুন কিছু শেখবার আমার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। আমি জানি জ্ঞানীগুণীরাই শুধু ভালবাসতে পারেন। আমি অপদার্থ, আমি কোনোদিন আমার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারব না। তবে আপনার কাছে কেন এসেছি? আমি 'ভয়েস' শুনছি আমাকে কারা সব শাসাচ্ছে, ভয়ে আমি সারা রাত জেগে থাকি। সকাল বেলায় ট্রামবাসের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়লেও, একেবারে থেমে যায় না। আমার অফিস যাওয়া বন্ধ, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। এ-বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন—এই আমার অনুরোধ।

দীপকবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ, রোগা-পাতলা চেহারা, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। ছোটভাই আমার কাছে এনেছেন। কয়েকদিন হল অফিসে যাচ্ছেন না, বাড়ীর বাইরে যেতে চান না, কারুর সঙ্গে কথাও বলেন না। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বিছানায় উৎকণ্ঠিত-

ভাবে বসে থাকেন। অনেক সাধ্যসাধনা, জোরজবরদস্তি করে ঘর থেকেবের করা হয়েছে। ভদ্রলোকের লেখায় হাত আছে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক। তাঁদেরই একজন আমাকে ওঁর ইতিহাস কিছুদিন আগে জানান। সংক্ষেপে তাঁর কথাতেই এখানে বিবৃত করছি।

—দীপকের বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে। স্ত্রী বরুণাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। দীপক বছর দুয়েক আগে এম-এ পাশ করে তখন চাকরীর চেষ্টা করছে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের দায়দায়িত্ব ওঁর ওপর পড়েছে। মা আগেই গত হয়েছিলেন। আমার দূরসম্পর্কের ভাইঝি বরুণা সেবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। তার কোচিং-এর কাজে দীপককে লাগিয়ে দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই প্রেমে পড়ে দীপক কয়েকটা ভাল কবিতা লিখে ফেলল। আমাকে সব কথাই ও খোলাখুলি বলল, আর বিশেষভাবে অনুরোধ করল দাদাকে বলে বরুণার সঙ্গে ওর বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে। বরুণার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তার বিশেষ অমত নেই। দাদা-বউদি প্রথমটায় একটু-আধটু আপত্তি জানালেন। কিছু দিনের মধ্যেই দীপকের চাকরী হল, কাজেই তাঁদের আপত্তির কারণ রইল না। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রথম বছর কয়েক দীপক খুব উৎসাহ সহকারে চাকরী ও সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করল। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। এরপর সাহিত্যচর্চার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। বরুণার সঙ্গে দেখা হলে শুনতাম অফিস থেকে এসে অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে দীপক। আলো জ্বালা থাকায় বরুণার ভালো ঘুম হয় না। বেশির ভাগই মনস্তত্ত্বের কেতাব পড়ে, বই থেকে খাতায় কি সব লিখে রাখে। আর এই সব নোট সন্তর্পণে ফাইলবন্দী করে নিজের ড্রয়ারে চাবিবন্ধ করে রাখে। বরুণা দেখতে চাইলে দেখায় না। এ নিয়ে কোনো আলোচনাও করতে চায় না। নিজের কাজে বছর দুয়েক বাইরে থাকার পর কলকাতায় এসে দীপকের খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা

প্রথম জানলাম। মাস ছয়েক হল চার বছরের বাচ্চা নিয়ে বরুণা বর্ধমানে তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। বলা উচিত, দীপক তাকে যেতে বাধ্য করেছে। দীপকের সঙ্গে কথা বলে কোনো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হল, ওর মাথায় গোলমাল ঘটেছে। বর্ধমানে গিয়ে বরুণার কাছে শুনলাম যে, দীপক স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে যে ওদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না। দীপক ওকে ভালবাসতে পারছে না, পারবেও না। বরুণার বাবা খুবই অর্থকষ্টে আছেন, সব জেনেও দীপক নিজের ছেলে-বৌ-এর খোরপোষ বাবদ এক পয়সাও দিতে রাজী নয়।

বন্ধুর চাপে আর ভাই-এর সাধ্যসাধনায় দীপক আমার কাছে এসেছেন। স্ত্রীর কথা উঠতেই তিনি আমাকে জানালেন, তিনি ভালবাসতে জানেন না, স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন না। তবে নির্যাতনমূলক 'হ্যালুসিনেশন' থেকে তিনি মুক্ত হতে চান, আমার চিকিৎসাধীন হতে তাঁর আপত্তি নেই!

এবার বরুণার কথা শুনুন: উনি যে বদলে যাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছিলাম। খোকনের জন্মের পর থেকে আমার ওপর ওঁর বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল। ঘুম ওঁর অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল না, অনেক বলে-কয়ে ডাক্তার দেখাতে পারিনি। অফিসে নিয়মিত যেতেন, গাদাগাদা বই নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সব বইই 'লাভ' আর 'সেক্স' সম্পর্কিত। হ্যাঁ, 'উইমেনস লিব' সম্পর্কে কিছু কিছু বইও ওঁর টেবিলে দেখতাম। আমেরিকার বড় বড় সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের লেখা ঐ সব বই থেকে প্রায় সারা রাত জেগে নোট নিতেন। ওঁর নোটগুলো ড্রয়ারে চাবিবন্ধ থাকত। শেষের দিকে উনি প্রায় ড্রয়ারে চাবি দিতে ভুলে যেতেন। সেই সুযোগে আমি ওঁর কিছু কিছু নোট দেখার সুযোগ পাই। বেশির ভাগ নোটই দুজন লেখকের রিপোর্ট থেকে নেওয়া। না, নাম আমার মনে পড়ছে না।···ওঁর পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার ওপর বিতৃষ্ণা ক্রমে সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত

হতে লাগল। বাচ্চাটাকে কোনোদিন আদর করেননি, একটা মিষ্টি কথা বলেননি, একটা জিনিস কিনে দেননি। মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। এক রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি একটা টর্চের আলো পড়েছে খোকনের মুখে, আর উনি নীচু হয়ে খোকনকে দেখছেন। আমি ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখে আলো ফেলে বুঝতে পারলেন যে আমি জেগে আছি। তক্ষুনি টর্চ নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি পরদিনই বাবাকে চিঠি লিখলাম আমাকে দিন কয়েকের জন্য নিয়ে যেতে। কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ধমানে এলাম। না, ওঁর কাছে ফিরে যাবার আমার ইচ্ছে নেই আর খোরপোষের দাবিতে মামলা দায়ের করতেও চাই না। একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছি, যেমন করে হোক খোকনকে আমি মানুষ করে তুলব।

বরুণা মেয়েটি স্থির ধীর বুদ্ধিমতী। নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলতে গিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না, খুব অল্প কথায় স্বাভাবিক গলায় আমাকে স্বামীর সন্দেহবাতিকের কথা শোনাল।

—আমার স্বামীর ভালবাসায় প্রথম প্রথম উচ্ছ্বাস ছিল অতিরিক্ত; একটি রাতও আমাকে ছাড়া ওঁর চলত না। আমি কোনরকম ওজর আপত্তি না জানিয়ে ওঁর দাবি মেটাতাম। উনি তাতেও যেন তৃপ্ত হতেন না, ওঁর ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটত না। মায়ের অসুখ করলে একবার কয়েক দিনের জন্য ওঁকে সঙ্গ দিতে পারিনি। তার জন্যে ওঁর অভিযোগের অন্ত ছিল না। অবশ্য সে-অভিযোগে কোনো তিক্ততা বা সন্দেহের ছোঁয়া থাকত না। হাঁ আমি ওঁকে ভালবেসেছিলাম, উনি আমাকে তখনই নানান ধরনের বই থেকে প্রেমের গল্প পড়ে শোনাতেন আর বলতেন, বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পর বছর দুয়েকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করে না, আমাদের যেন সে-রকম না হয়, সে-রকম আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমিও স্বামীর মতে মত দিয়ে তাঁর

নির্দেশমত নিত্য নতুন মিলনোৎসবে সহযোগিতা করতাম। তখনও বুঝিনি উনি 'মরবিড'; ওঁর ভালবাসা অসুস্থ পুরুষের দেহলিপ্সা মাত্র। যখন প্রথম জানলেন যে আগন্তুকের আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই ওঁর ভাবান্তর। প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—এত সব নিরোধের ব্যবস্থার পর ওসব হতেই পারে না, তুমি ভুল সন্দেহ করছ। ডাক্তারী পরীক্ষায় যখন সন্দেহের অবকাশ রইল না, তখন থেকেই ওঁর যৌন মনস্তত্ত্বে আগ্রহ ও সন্দেহ। শেষ পাঁচ বছর যে অপমান সইতে হয়েছে, সে-কথা কাউকে বলা যায় না, বলতে চাইও না।....এই প্রথম ওঁকে সামান্য উত্তেজিত দেখলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে দীপকবাবুর কাছ থেকে তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ শোনা গেল।

বরুণার সঙ্গে দেখা হবার আগেও দীপকবাবু প্রেমে পড়েছেন দু'একবার। তবে সে নেহাতই রোমান্টিক ধরনের প্রেম; কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা মাত্র। সহপাঠিনীর সঙ্গে অথবা পাশের বাড়ীর জানালায় দাঁড়ানো মেয়ের সঙ্গে মনে মনে প্রেমে পড়তেন আর তাদের নিয়ে কবিতা লিখতেন। তারা সে-সব কিছুই জানত না। তাদের সঙ্গে মিলনের স্পৃহা, তাদের কাছে পাবার ইচ্ছে পর্যন্ত ওঁর কোনো দিন মনে জাগেনি। বরুণার সান্নিধ্যে তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন প্রেমের তীব্র আকর্ষণ। মনে হল এই মেয়েটিকে তাঁর চাইই নইলে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। বিবাহের কিছু আগে থেকে কিছু কিছু যৌনশাস্ত্রের বই পড়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলন রহস্য জানলেন। আগে তাঁর যৌন-মিলনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম রাত থেকেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। বন্ধুরা বলেছিল এবং পুঁথিপুস্তকেও নাকি পড়েছিলেন, মেয়েদের মনে কামনা ঘুমিয়ে থাকে, কামনা জাগিয়ে তোলায় দায়িত্ব পুরুষের। সময়মত না জাগালে কামনার ফুল না ফুটে অঙ্কুরেই শুকিয়ে যেতে পারে।

পুরুষের দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। কবিরাজী ও হাকিমী দাওয়াই এবং কিছু কিছু মাদকদ্রব্যের সাহায্যে দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ঠিক মতই সমাধান করে চলছিলেন। গোলমাল বাধল শেষের দিকে, যখন জানলেন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও কি করে এটা সম্ভব হল? তিনজন ডাক্তারের অভিমত নিলেন; তাঁরা সবাই বললেন এরকম হতে পারে। তবু তাঁর বিশ্বাস হল না। হঠাৎ একদিন মনে হল বরুণাকে তিনি বোধহয় অতিমাত্রায় কামাতুরা করে তুলেছেন। ও বোধহয় ওর প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার অন্য কোনো সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। তাই বা কি করে হবে? বরুণাতো আজকালকার মেয়েদের মত বাইরে বাইরে ঘোরে না, এমন কি সিনেমা বা মার্কেটও দীপকের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে যায় না। পুরুষ বন্ধু কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে? বিশ্বখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকদের বই পড়তে আর নোট নিতে লাগলেন। একজন বলেছেন—যৌনপ্রবৃত্তি বলে কিছু নেই—সবটাই কল্পনা; অন্যজন লিখেছেন—যৌনবোধ মস্তিষ্কের ধর্ম, সহজাত প্রবৃত্তি নয়, সুতরাং যৌনাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। তবে তিনি এবং বরুণা নিয়ন্ত্রণ করেননি কেন? এরপর কিনসে এবং মাস্টারস ও জনসনের পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন নিয়ে মেতে উঠলেন দীপকবাবু। তাঁরা এ যুগের বাৎস্যায়ন। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের ইন্টারভিউ নিয়ে তাঁরা প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। এই প্রতিবেদনের প্রতিটি অক্ষর ধ্রুবসত্য বলে ভাবলেন দীপকবাবু। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল যে মিলনের তৃপ্তি ছাড়া কোনো বিবাহই সুখের হতে পারে না। মোট বিবাহ-বিচ্ছেদের চার ভাগের তিনভাগ ঘটে অসমন্বিত মিলনের দরুন। এ-সবই তাঁর ধারণার সঙ্গে মিলে যেতে লাগল, কিন্তু তিনি আর আগের মত বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন না। কেন? ঐসব রিপোর্টই তাঁর এই বিতৃষ্ণার কারণ। তাঁর ড্রয়ারে বন্দী মোট বই থেকে তিনি আমাকে অনেক কিছু পড়ে শোনালেন। কিছু

কিছু উক্তি তাঁর প্রায় মুখস্থ। ঐ দুটি প্রতিবেদনে এবং এ্যালবার্ট এলিস জুলিয়া শারম্যান প্রমুখের লেখা থেকে তিনি জানলেন যে মেয়েরা স্বভাবত যৌনমিলনে অনীহ, পুরুষের তুলনায় তাদের দেহের ক্ষুধা অনেক কম। অনেক সাধ্যসাধনার পর প্রথম মিলনে মেয়েদের রাজী করানো যায়। প্রথম মিলনের কথা তাঁর বেশ মনে আছে। বরুণাকে রাজী করাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাহলে? তাহলে কি বিয়ের আগেই ওর অভিজ্ঞতা ঘটেছে?—এই চিন্তা ভদ্রলোকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাঁর মিলনের ডাকে সব সময় সাড়া দিয়েছে বরুণা। তাহলে নিশ্চয়ই বরুণা স্বাভাবিক মেয়েদের দলে পড়ে না। দীপকবাবু যতই পড়তে লাগলেন ততই তাঁর মনে সন্দেহ অবিশ্বাস দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। প্রথম যৌবনে যখন অন্যান্য বন্ধুদের প্রেমের গল্প শুনতেন, তখন থেকেই তাঁর ধারণা যে তাঁর মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে। তা না হলে কোনো মেয়ে তাঁকে প্রেম জানায়নি কেন? তাঁর একবারও মনে হয়নি যে, বন্ধুরা বানিয়ে গল্প বলছে। অথবা ছোট একটা ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছে। নিজের এই দৈন্যবোধ দূর করার জন্যে তিনি বিবাহের পর থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পর্ণোগ্রাফি ও মাদকদ্রব্যের সাহায্যে বরুণার কাছে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চেয়েছেন। ক্রমশঃ তিনি নিঃসংশয় হলেন যে তিনি বরুণাকে তৃপ্তি দিতে পারেননি সে নিশ্চয়ই অন্যভাবে তার দেহের ক্ষুধা মিটিয়েছে। বরুণার দেহে তিনি অন্য পুরুষের গন্ধ পেতে লাগলেন। সন্তান যে ওঁর নয়, এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। এর পর সেনেকার লেখা পড়লেন **Only a wise man knows how to love.**

তখন থেকে 'ভয়েস' শোনা সুরু হল। জলদগম্ভীর স্বরে অনেক দূর থেকে মনে হয় হিমালয়ের কোনো গুহা থেকে কে যেন তাঁকে ডাকছে। ক্লিন্ন জীবন ছেড়ে চলে আয়। সংসারের মোহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আয় নারীদেহের আসক্তি থেকে মুক্ত করে তোকে

ভালবাসতে শেখাব, চলে আয়, বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ কাটল। ছেলেটার প্রতি ঘৃণা বাড়ল। দীপকবাবু ঠিক করলেন বরুণাকে বনবাসে পাঠাতে হবে; না হলে তাঁর মুক্তি নেই। এমনি সময় বরুণা নিজেই বর্ধমানে চলে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বরুণার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই তার গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন না। এর পর থেকে তার অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। 'ভয়েস' শুনে আগে তাঁর রোমাঞ্চ হত, নিজেকে অন্যলোকের উচ্চতর জীব কল্পনা করে তাঁর দেহমন পুলকিত হত। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছেন না, সে-সব কথাও কানে আসছে না। এখন কর্কশ কণ্ঠে সব সময় কে যেন তাঁকে শাসাচ্ছে। কী যে তাঁর অপরাধ তা বলছে না, অথচ শাস্তি দেবে বলছে। এবার মনে হচ্ছে বাড়ীর পাশের অন্ধকার বাগানটা থেকে যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কর্কশ রূঢ় স্বরে তাঁকে তিরস্কার করছে, গালমন্দ দিচ্ছে। দরজা-জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই, ঐ কর্কশ স্বর কানে আসবেই। সারা রাত ধরে তিনি ঐ ভয়েস শোনেন। দিনের বেলায় ট্রাম-বাসের শব্দে, মানুষের কোলাহলে কণ্ঠস্বরটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু একটু স্থির হয়ে যখনই কোনো কিছুতে মন বসাতে যান তখনই শুনতে পান—'সাবধান। পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, শাস্তি তোকে পেতেই হবে।' আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন দীপকবাবু এই ভয়েস শোনার যন্ত্রণা থেকে তাঁকে বাঁচাতে।

ঐসব প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা চলল কয়েকদিন ধরে। ঐসব অভিমত যে অভ্রান্ত সত্য নয়, এইটে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। অন্য দলের দু-চারজন পণ্ডিতদের লেখা তাঁকে পড়ে শোনালাম। যৌনতৃপ্তি না হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবেই একথা ঠিক নয়। ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছাড়া দৈহিক মিলনে তৃপ্তি আসতে পারে না। স্ত্রীকেও মানবিক মর্যাদা দিতে হবে, তবেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে আনন্দ পাবেন।

বরুণা তাঁকে সুখী করবার জন্য তাঁর অসুস্থ কামনার বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছে, এতে তার অন্তরের সায় ছিল না। সে আর পাঁচটা ভাল মেয়ের মতই স্বামীকে ভালবাসতে সুখী করতে চেয়েছিল। তবে তাঁর 'মরবিডিটি'কে প্রশ্রয় দিয়ে সে মারাত্মক ভুল করেছে—একথাও জানালাম। ক্রমশ তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের তীব্রতা কমতে থাকল। একজন নামকরা মনোবিদের কথা উদ্ধৃত করে বললাম:

Bad marriage leads to bad sex adjustment.

এই কথাটাই ঠিক। উল্টোটা অর্থাৎ Bad sex adjustment leads to bad marriage—এই কথাটা ঠিক নয়।

'আমি চলে যাব তীর্থ পথিক তিমির তমসা-তীরে'

—অচিন্ত্যকুমার

—আমার স্বামী অবসর নিয়েছেন, ছেলে দুটি ভাল কাজ পেয়েছে—স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে আছে। মেয়ে দুটিরও ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি তাদের জীবনে কোনো জটিলতা নেই; এবার আমি অবসর চাই। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি খুঁজে পেলেন আমার স্বামী? আমি আপনার রোগী নই। আমাকে ছেড়ে দিন। একটা বয়সে সবাইকে অবসর নিতে হয়।

—আমি আপনাকে তো ধরে আনিনি, ধরে রাখছিও না। মিঃ গোস্বামী বললেন, আপনি গত কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কোনো ব্যাপারে আর আপনার মন নেই। আপনাদের নতুন বাড়ী হল, দুদিন বাদে গৃহপ্রবেশ, বিদেশ থেকে বড় ছেলে ছুটি নিয়ে এসেছে, হায়দ্রাবাদ থেকে মেয়ে-জামাই এসেছে অথচ আপনি নাকি একেবারে নির্লিপ্ত। তাছাড়া ঘুম হচ্ছে না, খিদে নেই, অল্পেতে রেগে যাচ্ছেন....

বাধা দিয়ে মিসেস গোস্বামী বলে উঠলেন: বাজে কথা বলেছেন মিঃ গোস্বামী। ঘুম হবে না কেন? আমি কাজ করছি, হাতে জরুরী

কাজ আছে, ঘুমোবার সময় পাচ্ছি না। আমার স্বামী, এইতো কয়েক মাস আগেও, গাদাগাদা ফাইল অফিস থেকে বাড়ীতে এনে রাত ত্নটো অবধি জেগে কাজ করতেন। তখন কি আমি তাঁকে ধরে মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিলাম ?

মিসেস গোস্বামীর বয়স পঞ্চাশের ওপরে, রোগা ছিপছিপে লম্বা চেহারা, দাঁত পড়েনি, চুল পাকেনি। দেখে মনে হয় না যে তিনি চারটি সন্তানের জননী, চারটি নাতি-নাতনীর-দিদিভাই। গোস্বামী বছরখানেক হল চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন, ষাটের কোঠা ছুঁয়েছেন, শক্তসমর্থ দোহারা চেহারা দেখে মনে হয় 'একসটেনশন' পেলে আরো বছর দশেক বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিসে যাতায়াত করতে পারেন। স্ত্রীর কথার উত্তর তিনিই দিলেন: আহা সেতো দরকারী কাজ, আর আমি বহু বছর ধরেই তো ফাইল বাড়ী নিয়ে আসছি। আর তুমি সারা রাত ধরে যে সব কাজ কর, তা আগে কোনোদিন করতে না; ওগুলো বাজে, আই মিন, শখের কাজ, ওগুলো রাত জেগে করবার কাজ নয়।

—তোমার কাছে বাজে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে দরকারী; খুবই দরকারী। তোমার সঙ্গে আমার রুচি মিলছে না, তোমার মনের মত হয়ে আমি চলছি না, তার মানে এই নয় যে, আমি মনের অসুখে ভুগছি—বেশ ঝাঁঝালো সুরেই কথাগুলো বললেন মিসেস গোস্বামী। তার পরই হঠাৎ গলা নামিয়ে অন্য সুরে বললেন: আমি যে পারি না, ঐ সব না করে পারি না। ভেতর থেকে কে যেন তাগিদ দেয়, আমাকে বাধ্য করে, আমাকে তাড়িত করে। আমি পারছি না, তোমাদের এই সংসারে আমি আর থাকতে পারছি না, আমাকে ছুটি দাও। চৌত্রিশ বছর ধরে তোমাদের জন্যে। তোমাদের ইচ্ছে-মত কাজ করেছি, এবার আমাকে ছুটি দাও, আমার রুচিমত কাজ করতে দাও, আমাকে নিজের ইচ্ছেমত চলতে দাও।

—তোমার কোনো কাজ, কোনো অভিলাষে আমি তো কখনও

বাধা দিইনি। যখন যখন যা চেয়েছ তাই পেয়েছ। যা বলেছ, তাই করেছি।

— কারণ, এতদিন তুমি যা চাও আমি তাই চেয়েছি, তুমি যা বল আমি তাই বলেছি, তুমি যা বিশ্বাস কর আমি তাই বিশ্বাস করেছি। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া, বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছিলে। এতদিন আমি জানতাম না আমি কে আমি কি চাই, আমার জায়গা কোথায়। তাই বাধা দাওনি। আজ আমি জেনেছি আমি কে, আজ আমি টের পেয়েছি আমি কি চাই। আমার ইচ্ছেমত চলতে যাচ্ছি তাই বাধা দিচ্ছ, আমার রুচিমত কাজ করছি তাই পাগল বলছ।

স্ত্রীর কথার কোনো জবাব না পেয়েই বোধহয় গোস্বামী হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বাইরে যেতে বললাম। তিনি বেরিয়ে যেতে মিসেস গোস্বামীকে প্রশ্ন করলাম: কি আপনার ইচ্ছে মিসেস গোস্বামী? কোথায় আপনি বাধা পাচ্ছেন?

মিসেস গোস্বামী চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন, তার পর নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগলেন: আমি 'রিটায়ার' করতে চাই। আমি ছুটি চাই। অনেক অনেক বছর ধরে ঘানি টেনেছি, পাথর ভেঙেছি, সবজিবাগানের জন্যে জল তুলেছি। এই দেখুন আমার দু হাতে কড়া পড়ে গেছে; এই দেখুন, আমার পায়ে বেড়ির দাগ। আমি কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেতে চাই, সংসার থেকে মুক্তি চাই। সেই মুক্তি, ছেলে মেয়ে স্বামী, কেউই দিতে চান না। তাঁরা বলেন, আমি নাকি প্রলাপ বকছি। আর আমার ভাল লাগছে না। আমার চারদিকের বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, আমি মুক্ত বাতাস চাই।

—আপনি বিশ্রাম চান—এইতো? গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক, তারপর কর্তাগিন্নী দুজন বেরিয়ে পড়ুন। মাস ছয়েকের একটা প্রোগ্রাম করে

যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ান। এখন তো আর আপনার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।

সুন্দর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওঁর পাণ্ডুর মুখে।—দুজনে বেড়াতে গেলে বন্ধন থেকেই যাবে ; মিঃ গোস্বামীই বেড়াবেন, আমি তাঁর খেয়াল মেটাব আর তল্পী বইব। না, সে আমি চাই না।

—তবে ছেলেদের কারুর সঙ্গে তাদের চাকরীর জায়গায় চলে যান। তারা কি আপনাকে নেবে না।

—তাদের কথাই তো আপনি বলছেন। একজন বলছে কানাডায় চল, অন্যজন বলছে আসছে মাস থেকে ছুটি নিয়ে সে আমার পছন্দমত যে কোনো জায়গায় যেতে রাজী। বউমাদেরও আপত্তি নেই। মেয়ে বলছে হায়দ্রাবাদের মত শহর নাকি ভারতে নেই।

—ছেলেমেয়ে আপনাকে খুবই ভালবাসে। তাহলে। আপনি কোন্ জায়গা পছন্দ করেন ?

আবার সেই হাসি। খুবই করুণ দেখাল মিসেস গোস্বামীকে। এখনও তাঁকে আমি বুঝতে পারছি না। গোস্বামীর কাছে যা শুনেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলে তা সত্যি মনে হচ্ছে না। মিসেস গোস্বামীকে অসুস্থের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা !—ভেবে ঠিক করতে পারছি না। একটি মহিলা বিয়ের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সংসার করেছেন, চারটি ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তারাও বেশ সুখেই ঘরসংসার করছে। মাত্র কয়েক বছর আগে একটা শোক পেয়েছিলেন—ওঁর দাদার একমাত্র ছেলে স্কুলে যাবার পথে হারিয়ে যায়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মা-হারা ছেলেটি পিসীর কাছে মানুষ হয়েছিল। সেই সময় কয়েক সপ্তাহ মিসেস গোস্বামী নাকি স্নানাহার ছেড়ে দরজাজানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। সে সময় অনেক অল্পবয়সী ছেলে রাস্তাঘাট থেকে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যেত ; কারুর কারুর মৃতদেহ পাওয়া যেত, কারুর আবার কোনো সন্ধানই মিলত না। সে শোক

তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, তার পর ছোট মেয়ের খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছেন, জাঁকিয়ে সংসার করেছেন। তাঁর জীবনে আর কোনো দুঃখ শোকের ইতিহাস নেই। মা-বাবা শৈশবেই মারা যান; তাঁদের কথা ভাল করে মনেই পড়ে না। জ্যাঠামশাই বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর থেকে একটানা স্বামীর ঘর করেছেন। সরকারী চাকরী করতেন গোস্বামী, ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে, বিভাগীয় বড়কর্তা হয়ে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। ভদ্রলোককে অমায়িক বন্ধুবৎসল কর্তব্যপরায়ণ বলেই সকলে জানে। তবে অফিসার হিসেবে বেশ কড়া এবং মতামতের দিক থেকে বেশ গোঁড়া। হিন্দুশাস্ত্র, লোকাচার, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন; অবসর নিয়ে অথর্ববেদের বাংলা অনুবাদ লেখায় ব্যস্ত। নিজের বিভাগে এবং নিজের পরিবারে যতদুর সম্ভব নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ-ব্যাপারে কোনো বাধা পেলে তিনি মানতে চাইতেন না। ছেলেমেয়ের মতামত তিনি তা-বলে উড়িয়ে দিতেন না; বেদ পুরাণ উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের অভিমতের সপক্ষে তিনি এমন জোরালো যুক্তি খাড়া করতেন যে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারত যে তারা ভুল করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় সব ব্যাপারেই তিনি একমত ছিলেন। তাঁর অসাক্ষাতে ছেলেমেয়েরা মাকে বলত—'হিজ মাস্টারস ভয়েস'। ছেলেমেয়ে কি পড়বে, কোন চাকরী নেবে, কার কোন্ দিকে উন্নতির সম্ভাবনা—এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য ছেলেমেয়েরা জেনেছে মায়ের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেই বাবা পথ নির্দেশ করেছেন। তারা প্রতিবাদ করেনি, আর তাদের এখনও মনে হয় বাবা সঠিক পথই তাদের জন্যে বেছে দিয়েছেন। বিয়ের ব্যাপারেও পিতার মতই যুক্তিযুক্ত মনে করে তাদের সায় দিতে হয়েছে। এজন্য তারা দুঃখিত নয়, তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেও তারা মনে করে না। এ পর্যন্ত এই রকমই চলে এসেছে। একনায়কত্ব পারিবারিক শান্তিরক্ষার

সহায়ক হয়েছে, কোনো দিকে বিদ্রোহ-অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায়নি। গোলমাল ঘটেছে মাত্র কয়েক মাস আগে। মাঝারী ধরনের বাড়ীর নকসাটা ছোট ছেলে পছন্দ করেছে। স্ত্রীর সামনে ধরে গোস্বামী তাঁর অভিমত চাইলেন। নকসার দিকে না তাকিয়ে চা ছাঁকতে ছাঁকতে তিনি যে জবাব দিলেন, তার জন্যে গোস্বামী আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন : কিন্তু তুমি তো পেন্সিল স্কেচটা পছন্দ করেছিলে, তাইতো আমি ব্লুপ্রিণ্ট তৈরী করে মিউনিসিপালিটিতে জমা দিলাম। এখন তা বদলাতে গেলে অনেক হাঙ্গামা।

বদলাবার কথা বলিনি, পছন্দ হয়নি তাই বলেছি। এই বলে চায়ের কাপটা নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। উঁচু গলায় ঘর থেকে বললেন, শুধু নকসা নয়, নামটাও পছন্দ হয়নি।

—কিন্তু তখন তো ছেলেমেয়ে সবার সামনে এই নামই ঠিক হল, তুমিও তো মত দিলে।

—মত দিইনি, তুমি জোর করে আদায় করেছ। যেমন এ-যাবৎ অন্য সব বিষয়ে করে এসেছ।

এ ধরনের প্রতিবাদ এই প্রথম শুনলেন গোস্বামী। চায়ের কাপটা মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন। ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। আগে হলে মিসেস গোস্বামী ছুটে এসে কাপের টুকরোগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে জোড়া লাগানোর কথা ভাবতে বসতেন। স্ত্রীর এই ঔদাসীন্য গোস্বামীর সহ্য হল না। তিনি এবার ঘরে ঢুকে চড়া গলায় বললেন : 'তোমার নামে বাড়ীর নাম হবে—এতো অনেক দিন ঠিক হয়ে আছে। এতে তোমার আপত্তি কেন? না, এ আপত্তি মানতে রাজী নই, আর নকসা পাল্টানোও এখন তো সম্ভব নয়।' কথার কোনো জবাব এল না ঐ তরফ থেকে। মিসেস গোস্বামী তখন ছোট মেয়ের সেতারটা টেনে নিয়ে পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ টুং টাং শুরু করেছেন। তাঁর চড়া গলা গলায় আকৃষ্ট হয়ে ছোট

ছেলে, ততক্ষণে ওপরতলা থেকে নেমে এসেছে। ছোটবউ রান্নাঘর থেকে সব শুনছিল, সেও এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সবাই বিস্মিত, হতবাক।

এ-দৃশ্য ছেলে বউ কোনো দিন দেখেনি। গোস্বামীর মনে পড়ল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম এইভাবে মীনাক্ষী (মিসেস গোস্বামী) সেতার বাজাতেন। স্বামী বা শাশুড়ীর কাছ থেকে উৎসাহ পেতেন না, তাঁরা ভাবে ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন যে বিবাহিত মেয়েদের এইসব বাজে কাজ তাঁরা পছন্দ করেন না। যদিও বিয়ের কনে পছন্দ করার পর্বে মীনাক্ষীকে সেতার বাজানোর পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর শাশুড়ী গত হলেন, একের পর এক আগন্তুকদের শুভাগমন হতে থাকল, সেতার বাক্সবন্দী হয়ে ক্রমশ শোবার ঘর থেকে সিঁড়ির তলার আজেবাজে জিনিসের মধ্যে ঠাঁই পেল। বাড়ীর নকসা দেখানোর দিন থেকে মিসেস গোস্বামীর কিছু কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করতে লাগলেন বাড়ীর সকলে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের চাবি খুলে ছোটবউ-এর আঁচলে বেঁধে দিলেন, স্বামীপুত্রের খাওয়ার সময় অনুপস্থিত হতে লাগলেন, চা জলখাবার খাওয়া ছেড়ে দিলেন। গৃহস্থালীর জোয়ালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলেন।

তিনি ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। এই ইতিহাস মিসেস গোস্বামী কিছুটা বলেছিলেন আর কিছুটা শুনেছিলাম পুত্রবধূর মুখে। একটানা সংসার চালিয়ে যদি তিনি হাঁপিয়ে উঠে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটাকে ঠিক অস্বাভাবিক বলা যায় কি? এবার মিসেস গোস্বামীর কথা শুনুন।

—হ্যাঁ, ভাল আমাকে সবাই বাসে। ছেলেমেয়ে স্বামী সবাই। দাদা বুড়ো হয়েছেন, তবু সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যারাকপুর থেকে আমাকে দেখতে আসেন। অভাব-অনটন কোনো দিনই ছিল না, এখনও নেই। যেখানে যেতে চাই ছেলে জামাই সেখানেই নিয়ে

যেতে রাজী। কিন্তু ওরা পারবে না।

—কি পারবে না?

—আমি যেখানে যেতে চাই সেখানে ওরা নিয়ে যেতে পারবে না।

—অনেক দূরে বুঝি? কতদিন লাগবে যেতে? জায়গাটা কোথায়?

কাঁধের ঝোলা থেকে খানকয়েক কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন: জায়গাটা ওরা চেনে না। আমি জানি জায়গাটা কেমন, কিন্তু কোথায় কিভাবে যেতে হয় তা জানি না। জায়গাটার কয়েকটা স্কেচ এঁকে রেখেছি। দেখুন তো, আপনি যদি চিনতে পারেন, পথ বলে দিতে পারেন।—কাগজে আঁকা ছবিগুলো নানা দিক থেকে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করলাম। ছবি আঁকার হাত আছে মিসেস গোস্বামীর; কিন্তু কেমন যেন উদ্ভট, অদ্ভুত ছবিগুলো। সব কটা ছবিতেই তুটো জিনিস স্পষ্ট আর সবই অস্পষ্ট ঝাপসা। মরুপথ দিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে, কাঁধে ঝোলা, পরনে কালো রং-এর শাড়ি, হাতে একখানা পর্যটকের লাঠি। তার লক্ষ্য দূরের একটা পাহাড়, ধূসর পাথরগুলো সূর্যাস্ত আভায় ঈষৎ রক্তাভ। কিন্তু সব থেকে বেশি করে চমক জাগায় একটা বিরাট গুহা, ভিতরটা অন্ধকার। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা কয়েকটা জলধারা গুহাপথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্কিজো-ফ্রেনিকের আঁকা কিছু ছবি আমি দেখেছি; কিন্তু সেগুলোতে এমন নিপুণ তুলির আচড় নজরে পড়েনি। গুহাটা দেখলে সত্যিই ভয় হয়—যেন একটা বিরাট জন্তুর মুখগহ্বর।

—তমসা বলে একটা নদী আছে, তাই নয়? নদীটা কোথায় আপনি জানেন কি? জানেন না। না, আপনাকে গুরু করা হল না। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করি না। আমার পথ আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তমসার তীরে আমাকে যেতে হবে, একা একা পথ খুঁজে। আমি এই সব ছবি আঁকি, তাই ওরা বলে আমি

পাগলা। আচ্ছা পাগলে কি ছবি আঁকে?

—সারা রাত ধরে ছবি আঁকলে আর সেতার বাজালে লোকে ও-রকম ভাবতে পারে। অনেক মহান শিল্পীকে তাঁদের জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষ পাগল ভেবেছে।

—আমি যে না এঁকে পারি না। না বাজিয়ে পারি না। তবে সারারাত নয় ভোর পাঁচটা অবধি। ছোটঘরে দরজা জানলা বন্ধ করেই বাজাই। আমি ছাড়া সেতারের শব্দ আর কেউ শোনে না। যত আঁকছি তত আমি অভীষ্ট পথে এগিয়ে চলেছি, জায়গাটার চেহারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গভীর রাতে যখন বাগেশ্রী বাজাই, তমসা তখন আমার কাছে চলে আসে। তার ছলছল কলকল শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। মিলনের জোয়ার তমসার বুক থেকে আমার বুকে এসে ধাক্কা মারে। আমাকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে তমসা পাহাড় থেকে উঠে আবার পাহাড়ী গুহার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সাগরে যাবার চেষ্টায় মরুভূমির বালিতে গিয়ে পথ হারায়নি। আমার মত ভুল করেনি। আপনি চেনেন তমসা? তবে ছবিগুলো দিন। আমি ক্রমশ পথ দেখতে পাচ্ছি। দুচার দিনের মধ্যে ঠিক পথ খুঁজে পাব। তখন বেরিয়ে পড়ব। আর কোন বন্ধন থাকবে না আমার। পিছনে তাকবো না আর। এগিয়ে যাবো মুক্ত জীবনের পথে।

একটানে ছবিগুলো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোলায় পুরে মিসেস গোস্বামী বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার গোস্বামী এবার ঘরে ঢুকে খুসীমনে বললেন: ও চিকিৎসা করতে, ওষুধ খেতে রাজী হয়েছে। কবে আবার আসতে হবে জানতে চেয়েছে: সপ্তাহ খানেক বাদে? দশদিন হলে কি কোনো ক্ষতি হবে? তা হলে তাই আসব। রথযাত্রার দিন গৃহপ্রবেশ করব ভাবছি। 'মীনাক্ষী ভবন' নামের প্লেটটা আজ বসানো হবে। —তৃপ্তির হাসি হেসে গোস্বামী বিদায় নিলেন।

রথের দিন খবর পেলাম, আগের দিন ভোর থেকে মিসেস গোস্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট্ট নাতিটাকে বলে গেছেন তার জন্যে তমসার জল আনতে চলেছেন। জল নিয়েই ফিরে আসবেন। আমার দেওয়া ওষুধগুলো তাঁর ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে, একটা বড়িও তাঁর পেটে যায়নি। এতদিনে তিনি ইচ্ছেমত পথে বেরিয়ে পড়েছেন। মুক্তির ডাকে সংসারের সব বন্ধন ক্রমশ আলগা হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। নাতির বিশ্বাস দিদিভাই তমসার জল নিয়ে ঠিক একদিন ফিরে আসবেন।

১১

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'
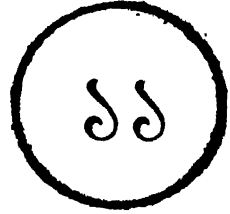
আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মেয়েটির ঠোঁট কাঁপল, কথা বেরুল না, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু চাপা কান্নার মত একটা আওয়াজ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে চেতনা হারাল। মিসেস রায় সঙ্গীর সাহায্যে কন্যাকে নিয়ে পাশের ঘরের সোফায় শুইয়ে দিলেন।

মিসেস রায় মফঃস্বল শহরের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। স্বামী ছিলেন ডাক্তার। বছর দশেক আগে সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলের বয়স তখন কুড়ি, মেয়ের বারো। ছেলে মেয়েকে তিনি বাপের অভাব বুঝতে দেন নি। অনেক দুঃখ কষ্ট, ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি পুরুষালী হয়ে পড়েছেন। ছেলে ডাক্তারী পাশ করে এখন আমেরিকার এক হাসপাতালে কাজ করছে। মেয়ে গত বছর কলকাতার এক বনেদী পরিবারের ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সময় বীথির সঙ্গে বিক্রমের পরিচয় হয়। বিক্রম একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করে। দাদার পাঠানো একটা ড্রাফট ভাঙ্গাতে গিয়ে বীথি বেশ মুস্কিলে পড়েছিল, সেই সময়

বিক্রম তাকে সাহায্য করে। প্রথম পরিচয়ের তিন মাসের মধ্যেই বীথি মাকে জানায় যে সে বিক্রমকে বিয়ে করতে চায়; মা যেন কলকাতায় এসে বিক্রমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব জানান। মিসেস রায় চিঠি পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কলকাতায় ছুটে আসেন। মেয়েকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করতে না পেরে অগত্যা বিক্রমের মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। জাতকুলের কোনো অমিল ছিল না, বীথিকে দেখে কোনো ছেলের বাপ-মায়ের অপছন্দ হবার কথা নয়। তাকে সুন্দরী বলা চলে। তাছাড়া একমাত্র পুত্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ এই বিয়ে না দিলে সে আর কোনো দিন বিয়েই করবে না। অনেক সাধ্য সাধনা করে এতদিন তাঁরা ছেলেকে বিয়ের ব্যাপারে রাজী করাতে পারেন নি, কাজেই তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন; বিয়ে হয়ে গেল। বীথি মেয়ে হস্টেল ছেড়ে সিমলের শ্বশুরবাড়ী থেকে ক্লাস করতে লাগল। মিসেস রায় কিন্তু এই বিয়েতে সুখী হতে পারলেন না। বিক্রমকে প্রথম দর্শনেই তাঁর অপছন্দ হয়েছে। চেহারার দিক থেকে বীথির উপযুক্ত না হলেও বিক্রম স্বাস্থ্যবান ও বিত্তবান। চাকরী এমন কিছু খারাপ করে না; তাড়াড়া এক-সময় তাদের পরিবারের এই নগরীতে খুব নামডাক ছিল। তবু কেন যে তিনি মেয়ের পছন্দ করা স্বামীকে অপছন্দ করলেন, তা তিনিই জানেন না। আজকালকার এই ধরনের বিয়েতে কি তাঁর সায় নেই? না, তা বলা চলে না। এদিক থেকে তাঁর কোনো সংস্কার নেই। ছেলে তো ভিনরাজ্যের এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, তিনি পুত্রবধূকে খুশীমনেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। পুত্রবধূ বিদেশে বেশ সুখেই আছে। বিয়ের সময়েই তাঁর মনে হয়েছিল যে বীথি ভুল করছে। আজ তাঁর অনুমান সত্য হতে চলেছে। জামাতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না।

মেয়েকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে মিসেস রায় সংক্ষেপে এই

ভূমিকা সেরে বললেন : আমাকে চিঠিতে বরাবর জানাচ্ছে যে সে ভাল আছে। বোর্ডের পরীক্ষার খাতা নিতে কলকাতায় এসে ওকে দেখে চমকে উঠলাম। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বীকার করল যে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ফিট হচ্ছে, এ অসুখ তার কোনো দিনই ছিল না। তাছাড়া, খিদে নেই, ঘুম নেই, যা খায় তা হজম হয় না, ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বেয়ান বললেন—এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই ; গুরুদেব হোম করেছেন, গ্রহশান্তি করা হয়েছে, কালীঘাটে তারকেশ্বরে মানত করা হয়েছে। একজন দৈবজ্ঞ বলেছেন আরও তিন মাস গ্রহের কোপ থাকবে, ততদিন ভুগতেই হবে। বেয়াই ও জামাই বাড়ী ছিলেন না। ওকে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই কলকাতা থেকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই। মেয়ে কিছুতেই যাবে না, আমিও ছাড়ব না। সে প্রায় আজ দশ দিন হল। আমার কাছে এসে ওর অসুখ আরো বেড়ে গেছে। রোজই এই রকম ফিট হচ্ছে দিনে ৪।৫ বার। স্থানীয় ডাক্তাররা সকলেই ওকে চেনেন, ওকে ভালবাসেন। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। তাঁদের পরামর্শ মত আবার কলকাতায় আসতে হয়েছে তাঁরা বলেছেন বটে ভয়ের কিছু নেই—হিস্টিরিয়া ; কিন্তু আমি একটুও ভরসা পাচ্ছি না। মেয়েকে আমি শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারব না। ওদের ওই ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম দু-তিন দিন ও সিমলের বাড়ীতে ফিরে যাবে বলে জেদ ধরেছিল, এখন আর সেসব কথা বলছে না।

স্বামী এর মধ্যে দেখতে যায় নি ? আপনি জোর করে আনার জন্যে তারা রাগ করে নি ?

—গত রবিবার দুই বন্ধু নিয়ে বিক্রম ওকে দেখতে আসে, নিয়ে যেতেও চায়। কিন্তু সেই সময়ে ওর ঘনঘন ফিট হতে থাকে। ঘণ্টা পাঁচেক থেকে ওরা ফিরে যায়। সেই থেকে মেয়ে আর শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইছে না। রাগ ওদের নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আমি মা

হয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারি না। ওদের রাগের চেয়ে আমার কাছে আমার মেয়ের প্রাণের দাম বেশী।

—মেয়ে আপনাকে কোন কিছু বলে নি ? স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কে ? আপনার কাছে অসুখের খবর গোপন করেছে কেন ? কি বলছে ?

—কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর হয় অজ্ঞান হয়ে যায়, না হয় অঝোরে কাঁদতে থাকে। দেখুন আপনি যদি কিছু জানতে পারেন। বিয়ে করে ভুল করেছে—একথা আমার কাছে কিছুতেই স্বীকার করবে না; আমি ওকে অনেক মানা করেছিলাম। সব ব্যাপারেই ছোটবেলা থেকে ও একগুঁয়ে আর জেদী।

বীথি মুখ খুলল। কয়েকদিন ধরে অল্প অল্প করে ওর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত অনেক কথা বলে গেল। বলার সময় প্রথম দিকে কয়েকবার খুব জোরালো ফিট হয়েছিল, ক্রমশ ফিট কমে এল, মুখ-চোখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক মনে হল। ওর কাহিনী যতটা সম্ভব ওর কথাতেই বলছি।

—'লভ এ্যাট ফাস্ট' সাইট্ ?' হ্যাঁ তাই তো বলা উচিত। কেন ওকে ভাল লাগল ? বলতে পারব না। কৃতজ্ঞতা বলা চলে না। ড্রাফটটা ক্যাশ করার ব্যাপারে আমাকে যে সাহায্য করেছিল, তার জন্যে ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট। তবে যেচে আমাকে সাহায্য করেছিল, আমি ওর কাছে সাহায্য চাই নি। হয়তো সেই জন্যে ওকে অন্যান্য ছেলেদের থেকে একটু স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল, এর বেশি কিছু নয়। কিছুদিন ধরে ক্লাসের একটি মেয়ে তার প্রেমের গল্প শুনিয়ে আমার কান একেবারে ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। তাই কি আমার মনে প্রেমে পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল ? 'আইডিয়াটা' বেশ 'সিলি'—তাই না ? মায়ের অমতে এত বড় ঝুঁকি নিতে গেলাম কেন ? আপনি জিজ্ঞাসা করার আগেও এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, উত্তর খুঁজে পাইনি। বিয়ের পর প্রথম মাস একরকম ভালই কাটল।

আপনাকে বলতে লজ্জা করছে না, কিন্তু মাকে কিছুতেই বলতে পারি নি। বিয়ের পর ওর বাবা মা দেশে চলে গেলেন, উদ্দেশ্য বোধ হয় আমাদের কলকাতাতেই মধুচন্দ্রিমা যাপনের সুযোগ দেওয়া। বিয়ের আগে যা যা বলেছিল, বিয়ের পর এক মাস ঠিক সেইসব করল, সেই মত চলল। রোজ রাতে ওদের ফুলবাগানে আমাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকত। বিরাট বাড়ী ওদের; ছাতটাও মস্ত বড় বড়। তার একপাশে লতা-পাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মত একটা জায়গা, সেখানে রোজ আমাদের ফুলশয্যা নয়, ফুলের বাসর বসত। লতাপাতার মধ্যে বিদ্যুতের জোনাকি জ্বলত, উঁচুতে জালের ফাঁক দিয়ে তারারা উঁকি মারত, মাঝে মাঝে সুইচ টিপে ছাতের আর এক প্রান্ত থেকে চাঁদের আলো আমদানি করত। ভক্তের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে আমি ধীরে ধীরে স্বর্গের দেবী হয়ে যেতাম। মনে হত, আমার দেহ শুধু ফুলে তৈরী; আমার দেহে রক্তমাংস নেই, আছে শুধু ফুলের গন্ধ আর তারার আলো। কোনো রাতে আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেনি, কোনো সময় আমারও মনে হয়নি আমার আর কিছু চাই। সারা রাত ধরে আমার মালঞ্চের মালাকরের স্তুতি শুনতাম। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হত, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনতে পেতাম, ঘুমন্ত বিক্রমের দিকে না তাকিয়ে দেবীত্ব বজায় রাখতে, সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। জেগে শুনতাম, ও অফিসে চলে গেছে। আমার ক্লাসে যাওয়া হত না। ওর সঙ্গে আবার দেখা হত সন্ধ্যার পর সেই ফুলের বাসরে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি শুধু স্বপ্ন দেখতাম, একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটত। ফিট কবে থেকে শুরু? হ্যাঁ, আমার মনে আছে। সব বলব। একটা কথা এখনও বলা হয়নি। সেটা আগেই বলা উচিত ছিল। ঠিক সময়ে মনে পড়েনি, তাই বলা হয়নি। ব্যাঙ্কে যখন ড্রাফট ভাঙানোর ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করল, আমি

যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম। ও আমাকে ডেকে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল— ধন্যবাদ চাই না, আমি আরো অনেকবার আপনার কাজে আপনার সেবায় লাগতে চাই। আমি বোধ হয় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, হয়তো আমার মুখে চোখে সেবা-তৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল। তাইতো ও বলতে পেরেছিল, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটু অপেক্ষা করলে আপনাকে আপনার হস্টেল অবধি একটা লিফট দিতে পারি।' তারপর থেকে রোজ দেখা হত, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন সল্ট লেকে, কোন দিন ফুটবলের মাঠে। একদিন 'প্রোপোজ' করল। সাদামাঠা কথায় নয়, কাব্য করে জানাল ও আমার মালঞ্চের মালাকর হতে চায়। প্রায়ই ও ঐ কবিতাটার লাইনগুলো আওড়াতো। আমার বুকে দোলা লাগত, চোখ কান গরম হয়ে উঠত, সারা দেহে শিহরন জাগতো। সুন্দর আবৃত্তি করে 'অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার/প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে/চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলি প্রান্তে/লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব/এই পুরস্কার।' বিয়ের পর ও কথা রেখেছিল। এক মাস আমি ছিলাম মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী, আর ও ছিল দীনভৃত্য। কিন্তু একদিন নাটকের দৃশ্য পাল্টালো। সেদিন থেকেই আমার ফিট শুরু হল

আমরা অনেক ধরনের মানুষ দেখি; অনেক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মানসিকতার মোকাবিলা করি। তাই চমক লাগানোর মত ঘটনার সামনাসামনি হতে হয় খুব কমই, অতি অদ্ভুত চরিত্রের দেখা মেলে কদাচিৎ। সেই অতিবিরল চরিত্রের একজন এই বীথি। কর্তব্যপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা প্রধান শিক্ষিকা মিসেস রায়ের কন্যার এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য মায়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বাস্তবানুগামিতা কতখানি দায়ী বলা কঠিন। তবে মাতা ও কন্যার আপাত বিপরীতধর্মী মানসিকতা যে একটা বিশেষ ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল একথা অনায়াসে বলা চলে। হয়তো এই বিরোধী চরিত্রের দরুনই তাঁরা

একে অপরের কমপ্লিমেন্টারী হতে পেরেছেন। এবার বীথির মুখেই তার ফিটের ইতিবৃত্ত শুনুন।

—সেদিন সন্ধ্যার আগেই বিক্রম আমাকে নিয়ে ছাতে উঠল। গিয়ে দেখি ওর আরো দুই বন্ধু উপস্থিত। এরা সাধারণত বাইরের ঘরেই বসে থাকে। আমাদের মিলনমন্দিরে ওদের দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল, কথাবার্তার তাল কেটে যেতে লাগল। ওরা তখন 'রম'-এর বোতল খুলেছে। এক-আধ পেগ মাঝে মাঝে বারে ঢুকে খেলেও বিক্রম কোন দিন বাড়ীতে মদের বোতল আনে নি। শ্বশুরশাশুড়ী নেই বলে ওর সাহস বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি। আমি তো রাজরাজেশ্বরী। কিন্তু কিছুতেই ওই বন্ধু দুজনের সামনে আমি নিজেকে ফুলরাণী বা রাজেন্দ্রাণী ভাবতে পারছিলাম না। ওদের কথাবার্তা ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল, ওদিকে আমার মন ছিল না। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে উঠে আসব ভাবছি। এমনি সময়ে ওদের একটা কথা কানে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। ইংরেজীতে কথা বলছিল, মদের নেশায় ভেবেছিল আমি ইংরেজী বুঝি না। ওদের একজন ডাক্তার, সেই ছিল প্রধান বক্তা। জড়িয়ে জড়িয়ে ভুল ইংরেজীতে সে বিক্রমকে আশ্বাস দিচ্ছিল। বলছিল—বিক্রম দুর্বল নয়, তার যথেষ্ট শক্তি আছে, সে 'কনসামেশনে' (বিবাহকে সহবাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা) সক্ষম। বিক্রমের বোধ হয় একটু কম নেশা হয়েছিল, সে কথাবার্তার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছিল ; কিন্তু ওরা বিক্রমের মৃদু আপত্তি ও ইঙ্গিত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। অন্য বন্ধুটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল, বিক্রমের শৌর্যবীর্যের প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে এমন সব অশালীন উক্তি করে বসল, যা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল ; ওদের সঙ্গ এড়িয়ে পালিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম, চোখের সামনের আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে যেন দপ করে নিভে গেল। পায়ের তলার মাটি যেন দুলে উঠল। সেই আমার প্রথম ফিট।

যে অশালীন উক্তি শুনে বীথি চেতনা হারাল, সেই উক্তি বীথির মুখ দিয়ে কিছুতেই বের করা গেল না। এইটুকু মাত্র জানাল যে, সেই সন্ধ্যায় তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বন্ধুদের চমক লাগিয়ে দেবে বলে বিক্রম ডেকেছিল বীথিকে। তার আগেই 'রমের' প্রসাদে তারা বে-সামাল হয়ে এমন কোন রূঢ় গুপ্ত কথা ফাঁস করে ফেলেছিল, যার আঘাত কল্পনাবিলাসী স্বপ্নলোকবাসী বীথি সহ্য করতে পারে নি। এইরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পার্টি অর্থাৎ স্বামীর সহযোগিতা বিশেষ দরকার। মিসেস রায় কিছুতেই বিক্রমকে খবর দিতে রাজী হলেন না। বীথিও এই সময়ে সম্পূর্ণভাবে মায়েব মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিক্রমকে খবর দিতে চাইল না। তাদের বাড়ী ফিরে যাবার কোন রকম ইচ্ছাও প্রকাশ করল না। অথচ, প্রথমটায় শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে মায়ের সঙ্গে আসতে সে রীতিমত আপত্তি জানিয়েছিল। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গোলমেলে, রহস্যময় মনে হল। সমস্যার সমাধান ঘটল অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। গল্প উপন্যাসে সাধারণত এরকম ঘটে থাকে। অফিস ডাক্তারের নির্দেশে বিক্রমই রোগী হয়ে মাস দেড়েকের মধ্যে আমার কাছে হাজির হল। তিনি জানালেন, ছেলেটি 'মাইসোফোবিয়া'তে (ময়লা লাগার ভয়) ভুগছে।

দিন তিনেকের মধ্যে রহস্য যবনিকা উঠে গেল। নিজের 'মাই-সোফোবিয়া' প্রসঙ্গে বিক্রম জানাল যে বছর তিনেক ধরে অল্প অল্প করে ময়লা লাগার ভয় তার মনে জাগছিল। বিয়ের পর থেকে ভয়টা বাড়তে থাকে ; গত কয়েক দিনে ভয় একেবারে চরমে উঠেছে। এখন ব্যাঙ্কে গিয়ে কোন ফাইল কোন কাগজপত্র, এমনকি কলিংবেল পর্যন্ত সে ছুঁতে পারছে না।

বিয়ের প্রসঙ্গে বলল : ময়লা ছোঁবার ভয়েই তিরিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করিনি। বয়ঃসন্ধিকালে কতকগুলো কু-অভ্যাস আয়ত্ত করেছিলাম। তা থেকে মনে নানা রকমের ভয় ঢোকে। মনে হয় বিয়ে করলে আমি বোধ হয় স্ত্রীকে সুখী করতে পারব না। চিকিৎসা ?

হ্যাঁ, তা প্রায় সব রকমই হয়েছে। ডাক্তাররা অনেকবার বলেছেন আমার ভয়ের কোন ভিত্তি নেই ; ওটা সাইকোলজিকাল। বিয়ে করলেই ভয় কেটে যাবে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ময়লার ভয়টা পরে এসেছে। এক বন্ধু আমার প্রাথমিক ভয় কাটাবার জন্যে আমাকে খারাপ পল্লীর এক বর্ষীয়সী রমণীর কাছে নিয়ে যায়। আসল ভয় কাটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হই। সেই দিন থেকে ময়লার ভয় আমাকে পেয়ে বসে। সেই থেকে নারীদেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। তবে বিয়ে করলাম কেন? পিছনে একটু ইতিহাস আছে। একজন হোমিওপ্যাথ বন্ধু আমাকে বোঝান যে 'প্লেটোনিক লভ'-এর মাধ্যমে আমার ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন কোথায় এমন মেয়ে পাওয়া যাবে যে 'প্লেটোনিক লভ পেয়ে' পেয়ে তৃপ্তি থাকবে? দৈবক্রমে ব্যাঙ্কে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। যাকে দেখেই মনে হল এতদিনে বোধ হয় সেইরকম মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। কয়েকদিন মেলামেশার পর বুঝলাম বীথি অন্য জাতের মেয়ে। মনে হল বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয়, কল্পলোকে বিচরণ করাই ওর স্বভাব। ঠিক আমি যা চাই সব কিছু পেলাম ওর মধ্যে। বিয়ের মাধ্যমে শুধু আত্মিক মিলন ঘটবে কোনোদিন আমাদের সম্পর্ক ক্লেদসিক্ত কলুষিত হবে না— এই শর্তে আমাদের বিয়ে হল। মাসখানেক আমি ঠিক ঠিক শর্ত মেনে চললাম। কিন্তু এর মধ্যেই আমার 'প্লেটোনিক লভ'-এর মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসা অনুভব করতে লাগলাম। ফলে 'মাইসোফোবিয়া' বাড়তে লাগল। স্ত্রীকে কিছুই জানাইনি। ডাক্তার বন্ধু বললেন 'কনসামেশনের' সময় এসেছে 'বি বোল্ড এ্যাণ্ড এ্যাসর্ট ইয়োরসেলফ'। ময়লার ভয়ের সঙ্গে তখন আর এক নতুন ভয় দেখা দিল বীথির কাছে সম্মান হারাবার ভয়। মনে হল বীথিকে ফুলরাণীর বেশে দেখলে বন্ধুরা আমাকে আর 'কনসামেশনের' ব্যাপারে উত্তেজিত করবে না। তাই একদিন ওকে আমাদের ফুলের বাসরে নেমতন্ন করি। সঙ্গে এল

আর একজন বন্ধু, সেই পতিতালয়ে নিয়ে গিয়ে আমার মনে ময়লার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় আমাদের পানের মাত্রাটা একটু বেড়ে যায়, আমরা বেশ বেচাল হয়ে পড়ি। ডাক্তার বন্ধু আমাকে 'কনসামেশন'-এর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকে। আর অন্য বন্ধুটি আমার একরাতের সেই ভুলের কাহিনী ফলাও করে বলতে থাকে, তার বক্তব্য আমি সে-রাতে আমার বীর্যবত্তার প্রমাণ দিতে পেরেছিলাম। তারও উদ্দেশ্য ছিল আমাকে উৎসাহিত করা আমার হীনমন্যতার ভার দূর করা। তারা বোধ হয় খেয়াল করেনি যে আমাদের আলোচনা বীথি শুনছে বা বুঝতে পারছে। সেই থেকে তার ফিটের অসুখ দেখা দিয়েছে। এ অসুখের কোনো ডাক্তারী চিকিৎসা নেই মনে করে মা দৈব চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। আর বীথিও আমাদের বাড়ীর ডাক্তারের কাছে যেতে রাজী হয়নি। পাছে সব ফাঁস হয়ে যায় – এই ভয়ে বাড়ীর ডাক্তারবাবুর কাছে আমি যাই নি। ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি, সব কিছু খুলে বলতে চেয়েছি। —ও কিছু শুনবে না আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না। আবার নিজের মায়ের কাছেও যাবে না। ওর ভয় তাহলে সেই পতিতালয়ের মেয়েটি আমাকে পুরোপুরি অধিকার করে বসবে। সেই কালসন্ধ্যা থেকে আমাদের ফুলের বাসর উঠে গেছে। আমি কাজে গেলে ও চিৎকার করে ওঠে, তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ওর মা এসে ওকে দেশে নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের পীড়াপীড়িতে ওকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখেই ওর ফিট হতে থাকে। ওর মা আমাকে অপমান করেই ওদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। 'প্লেটোনিক লভ' 'সেনসুয়াল লভ' দুই হারিয়ে এখন আমি দেউলে হয়ে গেছি।

প্রেম ও কাম সম্পর্কে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতার পর বিক্রমকে বিদায় দিলাম। মিসের রায় বিক্রমের আগমনবার্তা, শুনে খুশী হলেন না। বীথির অসুখ সারতে বিক্রমের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা

তিনি স্বীকার করলেন না। বাদী প্রতিবাদী দুইপক্ষেরই মামলা এক উকিল করতে পারে না—এই কথার উল্লেখ করে আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আমার পক্ষে বিক্রমের চিকিৎসার ভার নেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ। আমি অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত হলাম না। ইতিমধ্যে বীথির ফিট বারে ও তীব্রতায় অনেক কমেছে। শান্তভাবে সে আমার কথা শুনতে ও বুঝতে পারছে, প্রেম বিবাহ দেহের মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে তার বাস্তব জ্ঞান কিছুটা বেড়েছে। অপরিণত মন কল্পলোক থেকে বাস্তবজগতে বিচরণের উপযুক্ত হয়ে উঠছে। বিক্রমের অসুখের কথা ও তার আগের ইতিহাস ধীর ভাবে শুনল এবং মনে হল বিশ্বাসও করল। বিক্রমের 'মাইসোফোবিয়া' সারবে কিনা জানতে চাইল। আমি উত্তরে জানালাম, তারা দুজনে যদি পরস্পরকে ঠিক মত বুঝতে পারে ও অন্তত কিছুটা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তবে দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবে।
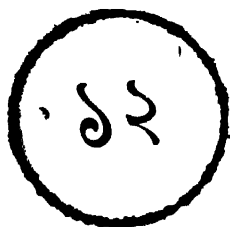
'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি
নৈনং দহতি পাবকঃ'

—মন অশুচি হলে সারা দেহটাই অশুচি হয়ে যায়, কিন্তু দেহ অশুচি হলেই মন অশুচি হবে—এমন কোনো কথা নেই। আর আত্মা? আত্মা তো দেহমনের অতীত—পরমাত্মায় লীন হবার জন্যে উদগ্রীব আত্মার বিনাশ নেই। পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, ভালমন্দ শুধু এই দেহ ঘিরে—তাই না? আপনি তো অনেক কিছু জানেন? বলুন না। অশুচি দেহ নিয়ে ঠাকুরকে ডাকা যায় না, ঠাকুরের পুজো দেওয়া যায় না। ঠাকুরকে না ডেকে, ঠাকুরকে না খেতে দিয়ে আমার তো খাবার উপায় নেই। অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া পাপ নয়। তাই নয় কি?—এই বলে আয়ত চোখ তুলে দেবলা আমার মুখের দিকে তাকাল।

তিরিশ বছরের মেয়ে দেবলা প্রায় চারদিন কিছু না খেয়ে আছে। তার দিদি ভগ্নীপতি অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে জল ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেন নি। কয়েকদিন ধরেই দেবলার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল ওরা। কিন্তু সেটা এমন কিছু বড় দরের নয়। দেবলার

স্বামী বিজয়েশ কয়েক সপ্তাহ হল দিল্লীতে। অনেকদিন বেকার থাকার পর নতুন চাকরী পেয়ে বিজয়েশ দিল্লী গেছে। অনেকদিন পরে অবস্থার বদল হতে চলেছে। নতুন উৎসাহ, নতুন আনন্দ নিয়ে দেবলা কাজকর্ম করবে—সকলে এই আশা করছিল। কিন্তু দেখা গেল, দূরসম্পর্কের দেবরের আমদানি রপ্তানী সংস্থায় মোটা মাইনেতে স্বামীর নিয়োগের পর থেকেই দেবলার ভাবান্তর ঘটেছে। প্রায় সব সময়েই কি যেন ভাবছে, দুতিনবার না ডাকলে সাড়া দেয় না, কাজকর্মে মন বসে না। গত কয়েকদিন হল তার নিত্যকর্ম গৃহদেবতার সেবা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, নিজেও অন্ন বর্জন করেছে। তার খুড়তুতো দিদি ইরা ও তার স্বামী নিখিল বিদেশে থাকে, ছুটিতে কলকাতায় এসে একটা হোটেলে উঠেছে। প্রায় বছর পনেরোর পর বোনের সঙ্গে দেখা হতেই তার মনে হয়েছে দেবলা যেন অন্য জগতের মানুষ। গীতা ভাগবত পড়া এবং গৃহদেবতার পুজো আরাধনা ছাড়া আর সব কিছুতেই তার অনীহা। দুই বোনের মধ্যে এক বছর কোনো যোগা-যোগ ছিল না। ইরা বিদেশে থাকতে শুনেছে বিপত্নীক জ্যাঠামশায় দেবলাকে অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। এর বেশি আর কোনো খবর ইরা জানত না। কলকাতায় এসে চেনাজানা সবার সঙ্গে দেখা করার কর্তব্য সারতে গিয়ে অনেক খুঁজে নারকেলডাঙ্গার এক বস্তীর পাশে জীর্ণ এক চুনবালিখসা বাড়ীর একটা ঘরে দেবলাকে আবিষ্কার করে। মাত্র কয়েক দিন আগে বিজয়েশ নতুন চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। সে ফিরে এলেই ওরা নিউ আলিপুরের একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। বিজয়েশের দূরসম্পর্কের ভাই রঞ্জন সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। বর্তমানে বস্তির এক বৃদ্ধা দেবলার বাইরের কাজকর্ম করে দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন রঞ্জন এসে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল দেখা করতে গিয়ে ইরা জানতে পারে যে চারদিন ধরে দেবলা উনুন ধরায়নি, দাঁতে কিছু কাটেনি। ওর কথাবার্তায়, আচার

ব্যবহারে, অস্বাভাবিকতার গন্ধ পেয়ে ওরা ওখানেই রাত কাটায়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। তারপর প্রায় জোরজবরদস্তি করে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। ইরা সমাজ-বিদ্যা নিয়ে চর্চা করে, ওর দু'চারটে লেখা আমার পড়া ছিল, পত্রযোগে পরিচয়ও ঘটেছিল। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ইরা বোনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল।

দেবলার প্রশ্নের জবাবে বললাম: আত্মহত্যা গর্হিত পাপ। তুমি নাকি অনেক ধর্মশাস্ত্র পড়েছ: কোথাও কি আত্মহত্যার অনুমোদন আছে?

—আত্মহত্যা করতে যাব কেন? উপোষ করে পাপ দূর করছি। আজকাল ডাক্তারাও বলেন উপোষ করলে অনেক অসুখ সেরে যায়। আপনি নিশ্চয়ই সে কথা জানেন।

—ডাক্তারের নির্দেশে উপোষ করলে তোমাকে আমরা বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমি তো নিজের খেয়ালে উপোষ করছ; আর এইতো একটু আগেই বললে, অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি না খেয়ে থাকার পণ করেছ। নিজের দেহকে অশুচি ভাবছ কেন?

—শুধু দেহ নয় মনটাও অশুচি হয়ে গেছে। তাইতো আত্মশুদ্ধি করছি। যিনি ডাক্তারের ডাক্তার আমার সেই ঠাকুর আমাকে উপোষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বলে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে গীতা আওড়াতে লাগল—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়াং / ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো/ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

ইংরেজীতে ইরাকে জানালাম যে আমার কিছু করবার নেই। এখনই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ইরা আমাকে ওর ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল যে দেবলা ইংরেজী জানে না। ওর বাবা ওকে ইস্কুলে পাঠাননি, ইংরেজী

শেখাননি; শুধু বাড়ীতে রেখে নিজে বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়েছেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। ইরার কাছে যা জেনেছিলাম তা পরে বলছি।

হঠাৎ শ্লোক আওড়ানো বন্ধ করে দেবলা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলে উঠল: আমাকে এখুনি যেতে হবে, এতক্ষণে বোধ হয় দীনুদা এসে গেছে, গোপাল আমার চারদিন না খেয়ে রয়েছে। দীনুদা নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

কথাগুলোর মানে ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকাতে ও বুঝিয়ে দিল। দীনুদা পাশের বস্তিতে থাকে, যে মেয়েটি দেবলার বাজারহাট করে, তার স্বামী, আর 'গোপাল' ওর গৃহদেবতা। ইরা দেবলার কাছে গিয়ে ও পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

—সে ব্যবস্থা আমি তো করে এসেছি। দীনুদা পুরুতমশাইকে নিয়ে আসবেন, তিনি তোমার গোপালের সেবার ভার নিতে রাজী হয়েছেন। এতক্ষণে হয়তো তোমার গোপালকে নিয়ে তিনি নিজের মন্দিরে চলে গেছেন।

আরো বেশী অস্থির হয়ে উঠল দেবলা। সে তখুনি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। শুধু গোপালকে নিলেই তো হবে না; তার কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর ওকে বের করে দিতে হবে। শীত আসছে। গরম কাপড় গায়ে না দিলে গোপালের কী কষ্ট হয়—তা পুরুতমশাই জানবেন কি করে? তাছাড়া কখন গোপাল কি খাবে, কি চাইবে, সব তো পুরুতমশাইকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। গোপাল তো অন্যের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইবে না।

—সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। আমরা ফিরে না গেলে পুরুতমশাই গোপালকে নিয়ে যাবেন না। তোমার কোনো চিন্তা নেই। স্থির হয়ে বসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বল। উনি তোমার অনেক কথার

জবাব দিতে পারবেন—যা আমরা পারিনি। তারপর তোমার জামাইবাবু গাড়ী নিয়ে এলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

আমার নির্দেশমত নিখিল তখন পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোনে একটা নার্সিংহোমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। দিদির কথায় বোধহয় দেবলা একটু আশ্বস্ত হল। শান্ত হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : খুব বড় দরের পাপ না করলে আত্মার সদ্গতি হয় না। তাই না? আমার স্বামী দিল্লী থেকে তাই লিখেছেন। অনেক কিছু লিখেছেন। দিল্লীটা তরাইয়ের জঙ্গল। বাঘ ভাল্লুকরা সব লড়াই করছে। সবাই পাপচক্রের এজেণ্ট। আমরা রেসের ঘোড়া, রঞ্জনরা জকি। আরো লিখেছেন, তাঁকে আমাকে এগিয়ে চলতে হবে, আরো জোরে ছুটতে হবে, ঐ রঞ্জনদের সওয়ার করে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। এ যুগের অন্য সকলের মত আমাদেরও আরো চাইতে হবে, আরো পেতে হবে। থেমে থাকলে চলবে না। সব কথা আমার মনে পড়ছে না। ওঁর বন্ধু কৃষ্ণমূর্তি লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা করেন। তিনি নাকি সুন্দর সুন্দর অনেক কথা বলেছেন। সেসব কথা আমি বুঝি না, আমার গোপালও বোঝে না। রঞ্জনের কথা তবু বোঝা যায়, কৃষ্ণমূর্তি একেবারে দুর্বোধ্য। শুনবেন?

এ-সব ক্ষেত্রে সব চিকিৎসকের যা করতে হয়, আমাকেও তাই করতে হল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাত-ব্যাগ থেকে একটা দলাপাকানো চিঠি বের করে দেবলা পড়ে চলল।

—আমলাধানী, রাজধানী—ইত্যাদি অনেক কিছু নাম আছে দিল্লীর। আমার মনে হচ্ছে দিল্লী কাশী মক্কা জেরুসালেমের মত এক মহান তীর্থক্ষেত্র।....তীর্থক্ষেত্রে পাপ খণ্ডাতে মানুষ সব থেকে প্রিয় জিনিসটি উৎসর্গ করে, এখানেও তাই চলেছে। অনেক পাপ করার পর আমলা ঠিকাদাররা নিজেদের স্ত্রীকন্যা উৎসর্গ করেছেন। আমাকেও করতে হবে, তারপর আমার পাপের জন্য আমার সব থেকে প্রিয়

জিনিসটি উৎসর্গ করতে হবে। কৃষ্ণমূর্তি বলল, হ্যাঁ পাপ। কিন্তু এ পাপ তো আমরা করছি না। আমরা তো এজেণ্ট, রবার স্ট্যাম্প। আর বলল, সব থেকে দামী জিনিস বলি না দিলে মোক্ষলাভ হয় না।

চিঠির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। দীর্ঘ চিঠি পড়ার পর হঠাৎ ওর চোখদুটো সজল হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে নিজের মনে বলতে লাগল: আমার দেহে বাইরের ময়লা লেগেছে. আমার দেহ অপবিত্র। কিন্তু অন্তরের শুচিতা তো নষ্ট হয়নি। তবে কেন তোমাকে ছুঁতে পারছি না, গোপাল? তোমাকে খাওয়াতে পারছি না, নাওয়াতে পারছি না, তোমার আরতি করতে পারছি না। না, আমার মনেও বোধহয় পাপ ঢুকেছে। এরপর আবার উঠে বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হল। আবার ইরা বুঝিয়েশুঝিয়ে চেয়ারে বসাল।

নিখিল ঘরে ঢুকে ইংরেজীতে জানাল যে আজ সন্ধ্যায় একটা বেড খালি হবে, কাল ওরা ভরতি করে নেবে বলেছে।

চোখ মেলে ইরার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে তোমরা হাসপাতালে পাঠাচ্ছ। ভেবেছ, তারা আমাকে খাওয়াতে পারবে। আমার গোপালের খাওয়া হয়েছে না জানলে কেউই আমাকে খাওয়াতে পারবে না।

· হাসপাতালে যেতে হবে কেন? যত সব আজগুবি কল্পনা।

—দুচারটে ইংরেজী কথা আমি বুঝি ইরাদি। তোমরা আমাকে হাসপাতাল কি নার্সিং হোমে পাঠাবে। আমি তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল: তুমি যদি খাওয়াদাওয়া কর —অন্তত শরবত, কমলালেবু কিছুটা মুখে দাও তবে আর কোথাও পাঠাতে হবে না।

—গোপালের পেটে কিছু না পড়লে আমার খাওয়ার উপায় নেই। গোপালের ভোগ দেওয়া হবে, আরতি হবে, ঠাকুর জানবেন যে আমার মনে ময়লা লাগেনি, তবে আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে।

তার আগে জোর করে আমাকে কিছু খাওয়ালে কোন ফল হবে না, সব খাবার বমি হয়ে যাবে। আমাকে তোমরা খাওয়াতেও পারবে না, হাসপাতালেও পাঠাতে পারবে না। বুঝলে ইরাদি।

—বেশ, তাই হবে। এখন বাড়ী চল। গাড়ী এসে গেছে। কেউ জোর জবরদস্তি করবে না। ইরার কাঁধে দেহের ভার রেখে ধীরে ধীরে দেবলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত্তিরটা ওর ওপর বিশেষ নজর রাখা দরকার—এই কথাটা ইরাকে বারবার বুঝিয়ে দিলাম।

শেষের কথা বলার আগে রোগিনীর পারিবারিক ইতিহাস কিছু জানাচ্ছি। এ-ইতিহাসের কিছুটা ইরার জানা ছিল, আর বিজয়েশের কথা ইরা বিজয়েশের পিতৃবন্ধু ডাক্তার পালের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল।

দেবলার পিতা এক কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন। ছোট ভাই ইরার বাবা ছিলেন সরকারী আমলা। দেবলার দিদি দেবযানীর বিয়ে নিয়ে তুই ভাইয়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে, সেই থেকে তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে বাস করতে থাকেন। ইরার বয়স তখন সতেরো, কলেজে পড়ছে, আর দেবলা বছর আটেকের মেয়ে। দেবযানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী এক আহমেদকে বিয়ে করতে চায়। বাবা মত দিলেন না। বাবার অমতে বিয়ে করে তুজনে বিদেশে চলে যায়। দেবযানী ও দেবলা তুই বোনই ছিল অপরূপ সুন্দরী, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেবলার মায়ের মৃত্যু হয়। দেবলার বাবা তাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বাড়ীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে যেন তার আগ্রহ না জন্মায়, এদিকে তিনি কড়া নজর রাখলেন। নিজের সব ইংরেজী বই একঘরে আলমারী বন্দী করে ঘরটায় তালাচাবি দিলেন। কয়েক বছর পরে খবর পাওয়া গেল দেবযানী আহমেদকে ত্যাগ করে একটি ফরাসী ছেলেকে বিয়ে করেছে। মাসখানেকের মধ্যে দেবলাকে বিজয়েশের হাতে তুলে দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি কোনো এক মঠের নামে উইল করে প্রায় একবস্ত্রে তীর্থ ভ্রমণে

বেরুলেন। সেই থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এর পরের খবর ইরা জেনেছে ডাঃ পালের কাছে। বিজয়েশের বাবা-মা তার বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই মারা যান। আদর্শবাদী বিজয়েশ পিতৃসম্পত্তি ও শ্বশুরের দেওয়া টাকায় নদীয়া জেলায় কিছু জমি কিনে ক্ষেতমজুরদের অংশীদার করে নতুন পদ্ধতিতে চাষবাস ও হাঁসমুরগী পালন আরম্ভ করে। তিন বছরের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে স্কুল মাষ্টারী করতে থাকে। সেখানে তার আদর্শের সঙ্গে প্রবীণ শিক্ষকের আদর্শের সংঘাত বাধে, ফলে চাকরী ছাড়তে হয়। এরপর স্ত্রীর গয়নাগাঁটি বেচে নিজে একটা আদর্শ শিশু-বিদ্যালয় খোলে। শিশুদের অভিভাবকরা কিছুতেই তার আদর্শ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য বুঝে উঠতে না পারায় ছাত্রাভাবে স্কুল উঠে যায়।

কয়েক বছর চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনোমতে বেঁচে থাকে। এমনি সময় কালীঘাটে দূর সম্পর্কের এক ভাই রঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম দর্শনেই রঞ্জন বৌদি দেবলার একান্ত ভক্ত ও বিজয়েশের অকৃত্রিম সুহৃদ হয়ে ওঠে। দুঃখ কষ্ট-দারিদ্র্যে দেবলার রূপলাবণ্য বিশেষ ম্লান হয়নি। নিঃসন্তান দেবলার যৌবনশ্রী রঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছে—দেবলা বুঝতে পারে। রঞ্জনের ফার্মে চাকরী নেবার কথা উঠলে স্বামীর উৎসাহে সে সাড়া দিতে পারেনি। আদর্শবাদী বিজয়েশ কয়েকদিন নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে পরে রঞ্জনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। দারিদ্র্য, দৈন্য, বিশেষ করে দেবলার দুঃখ-কষ্ট তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়েশ বুঝতে পেরেছিল আমদানি-রপ্তানী ফার্মের সাইনবোর্ডের আড়ালে রঞ্জন নানা ধরনের কালো টাকার কারবার চালায়। সেই কারবারের দেবতার পূজার নৈবেদ্যে সুন্দরী নারী অতি-প্রয়োজনীয় উপচার। রঞ্জন দেবলার দেহ তার ফার্মের কাজে নিয়োগ করতে পারে—এ ভয় স্বামী স্ত্রী দুজনের মনেই জেগেছিল। কিন্তু দুজনেই দুজনের মনের কথা মনে চেপে রেখেছিল,

একে অপরকে জানায় নি। বিজয়েশকে দিল্লী পাঠিয়ে রঞ্জন একরকম খোলাখুলিই তার মতলব প্রকাশ করল।

এই অংশ দেবলার অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরে ইরা আমাকে জানায়। এ-ছাড়া ডাক্তার পাল বলেন যে, সন্তান না হবার কারণ অনুসন্ধানের ফলে বোঝা যায় যে বিজয়েশই এর জন্য দায়ী, দেবলার দিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। এ খবর খুব সম্ভব দেবলা জানত না। তার অন্তরের বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি ঘটেছিল বালগোপালের মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে।

রঞ্জনের আবেদন-নিবেদনে অস্থির অতিষ্ঠ উদভ্রান্ত দেবলা দিল্লীতে স্বামীর কাছে খোলাখুলি কিছু জানাতে সাহস পেল না। রঞ্জন শক্তিশালী, রঞ্জন মরিয়া হয়ে বিজয়েশকে পোকার মত টিপে মারতে ইতস্তত করবে না। মদের ঘোরে রঞ্জনের বেপরোয়া কথাবার্তা থেকে ও বুঝতে পারে বিদেশী কোনো এক বিশেষ গুপ্তচর চক্রের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। একদিন রঞ্জনের দৃঢ় আলিঙ্গন পাশ থেকে কোনমতে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় যে, তার গোপালকে অন্য কোথাও রাখার বন্দোবস্ত করে সে রঞ্জনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে গোপালের সামনে—ছিঃ। গোপাল যে ওর সন্তান। সেইদিন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ হয়েছে আর মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এ-সব কথা পরে জানা যায় ইরার হোটেলের ঠিকানায় লেখা দেবলার একখানা চিঠি থেকে।

শেষ অংশ ইরার মুখে শুনুন।

—আপনার এখান থেকে যাবার পর দীনুদার পুরুতমশায়ের হাতে গোপালকে সমর্পণ করল, সঙ্গে গোপালের জন্যে ওর নিজের হাতে তৈরী জামা কাপড় মালা গয়না।

পুরুতমশাইকে বারবার বুঝিয়ে দিল কোন পার্বণে কি ভোগ দিতে হবে কোন তিথিতে কোন ফুলের মালা দিতে হবে, কোন ভজনটি

শুনতে গোপাল সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তারপর ওকে অনেকটা শান্ত মনে হল। আমার নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছে জানাল। আপনার দেওয়া ঘুমের ওষুধটা খেতে আপত্তি জানাল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। দু'চারবার ডাকতেও সাড়া দিল না। গায়ে নাড়া দিয়ে মনে হল গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে। আমরা আলো নিভিয়ে, দরোজায় তালা লাগিয়ে দীনুদাকে দরোজায় পাহারা রেখে কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে যা কিছু হোক দুটো পেটে দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। রাত বেশি হয়েছিল, ও দিকটায় দোকান-পাটও কম। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আমাদের ফিরে আসতে বোধহয় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। ফিরে এসে দীনুদাকে বাড়ী পাঠিয়ে সন্তর্পণে দরোজা খুলে দেখি দেবলা তখনও ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আমরা মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধহয় একটা ইঁদুরের কামড়ে তন্দ্রাটা চট করে ভেঙে গেল। আলোর সুইচ টিপলাম। দেবলার দিকে নজর পড়তে মনে হল ওর মুখ দিয়ে যেন লালা পড়ছে। ওকে নাড়া দিতেই সব বুঝতে পারলাম।

—বিষ কোথায় পেল ?

—বাড়ীতেই ছিল। ফলিডল। হাতের মুঠোতে একটুকরো কাগজ পেলাম। তাতে লেখা ছিল :

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।

নঃ চৈনং ক্লেদযন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু, বিজয়েশের চিঠিটা না পেলে হয়তো ও এইভাবে মরত না। চার্মিং রোগ ঐ রঞ্জনকে ও ঠিক ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চিঠিটাতে স্বামীর পরোক্ষ সম্মতির ইংগিত আছে মনে করেছিল দেবলা।
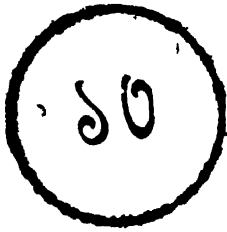
"But hail thou goddess sage
and holy,
Hail, divinest Melancholy"
—Milton

মিসেস্ হাজারী বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। বছর তিনেক ধরে তিনি কোনো কাজকর্মে মন বসাতে পারছেন না। গৃহস্থালীর কাজ ভাল লাগে না, বই পড়তে ভাল লাগে না, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে না, গল্প করতে বা শুনতে আগ্রহ নেই। অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন, সকালে বিছানা থেকে উঠতে চান না, সবরকম খাদ্যে অরুচি, সব ব্যাপারে অনীহা। এখন তাঁর বয়স ৪৮। ডাক্তাররা বলেছেন, এসব রজঃরোধের মেনোপোজ আনুষঙ্গিক উপসর্গ; এ-নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই; কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। ট্রাংকু-লাইজার, ভিটামিন, আয়রন টনিক অনেক খেয়েছেন। ওষুধ খেতেও আর ভাল লাগে না। ছোট মেয়েটির বিয়ের পর থেকে বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু উপসর্গও দেখা দিয়েছিল

আরো বছর সাতেক আগে, সেই সময় তাঁরা আলাদা বাড়ী করে কলকাতার বাসা ছেড়ে গড়িয়াতে উঠে যান। বড় মেয়ের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে অসুখটা বেশ কিছুটা বাড়ে। কলকাতায় বাসায় হাজারীরা তিন ভাই একত্র থাকতেন। বড় ভাই সওদাগরী অফিসে চাকরী করেন, ছোট ভাই শিক্ষকতা করেন, আর মেজ ভাই শ্যামলবাবু একজন করিৎকর্মা ঠিকাদার। লেখাপড়া তিন ভাই-এর মধ্যে সব থেকে কম শিখলেও রোজগারের দিক থেকে শ্যামলবাবু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রধানত তাঁর রোজগারেই সংসার চলত। বড় ভাই অফিস আর ক্লাব নিয়ে থাকতেন, ছোট ভাই-এর কাজ ছিল বাজার করা আর সংসারের কখন কি দরকার তার খোঁজ রাখা ও জোগান দেওয়া। শ্যামলবাবুর কাজ ছিল ছোট ভাই-এর চাহিদামত টাকা দিয়ে যাওয়া। এইরকম করে মিসেস কমলা হাজারীর বিয়ের পর আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত যৌথ পরিবার বেশ ভালভাবেই চলছিল। কোনো ঝগড়াঝাঁটি মতবিরোধ দেখা যায়নি। মেজবৌ কমলা অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁরই নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় সংসার চলত। বড়বৌ চিররুগ্ন, হাঁড়িহেঁসেলের দিকে ঘেঁষতেন না। ছোট ভাই বিয়ে করেনি, বাড়ীর কাজ আর মাস্টারী টিউশানী নিয়েই তার দিন কেটে যায়। মায়ের অনুরোধ উপরোধে হেসে বলত যে তার পুষ্যি বাড়ানোর মত ক্ষমতা নেই। বড় ভাইয়ের চারটি ছেলে ও মেজর তিনটি মেয়ে নিয়ে প্রায় ১০।১২ জনের সংসারে সব ঝক্কি সামলাতেন মেজবৌ। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে কোনোদিন অনুযোগ করতে কেউ শোনেনি? কাজের চাপের মধ্যেও নিজের শরীরের যত্ন নিতে তাঁর ভুল হত না। নিয়মিত প্রসাধন করতেন। দেহশ্রী বজায় রাখতে ছোটবেলায় শেখা যোগব্যায়াম রোজই অভ্যাস করতেন। স্বাস্থ্যশ্রীতে তাঁর দেহ ঝলমল করত, তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে সব সময়েই লেগে থাকত।

আজকে ওকে দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে সাত বছর আগে ও কেমন ছিল! ওর সে সময়কার ফটো দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না যে সেটা ওরই ফটো। আমার সময় খুবই কম; বাড়ীতে রাত এগারোটার আগে ফিরতে পারি না, ভোরবেলায় ওর বিছানা থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে যেতে হয়। ওর দিকে ভাল করে তাকাবার সুযোগ আমার কম হয়। কিন্তু যখনই তাকাই চমকে উঠি। আমারই মনে হয় যেন অন্য কোনো মেয়েকে কমলা মনে করছি।

এই বলে শ্যামল হাজারী তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য শেষ করলেন।

—নিজের বাড়ীতে উঠে আসার পর থেকেই ওঁর পরিবর্তন শুরু হয়েছে তাই না? এই ব্যাপারে ওঁর কি অমত ছিল।

—না, একেবারেই না। আমিই বরং নানা অজুহাতে দিন পেছিয়ে দিচ্ছিলাম। ওইতো একরকম নিজেই সব ব্যবস্থা করে চলে এসেছিল। মায়ের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে পুরনো বাসা ছাড়বার ইচ্ছে আমার ছিল না। তিন মাস যেতে না যেতেই ওর এই চলে আসাটা কেউই ভাল চোখে দেখেনি। আত্মীয়স্বজন মহলে এ নিয়ে আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। না—আমার দাদা বৌদি কিছু বলেননি, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ জানাবার মত মানুষ তাঁরা নন। তবে ছোট ভাই আর বাচ্চাগুলো নানারকম বাধার সৃষ্টি করেছিল; তাই ছোট ভাই তো রাগ করে আগের কয়েকদিন বাড়ীতে আসা বন্ধ করেছিল। কমলার সংকল্প থেকে তাকে কেউ টলাতে পারেনি।

—মায়ের মৃত্যুর পর কি জায়ে জায়ে বনিবনাও হচ্ছিল না?

—মনে তো হয় না; তাহলে নিশ্চয়ই আমার কানে আসত। বৌদিতো সংসারের কোনো কিছুতেই থাকতেন না, দাদা তাঁর থিয়েটারের দল নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কোনো কিছুতেই নজর দেবার সময় নেই, ছোট ভাই তো যাকে বলে সেই—দেবর লক্ষ্মণ। সংসারে সব ব্যাপারে ওর মতামতই চিরকাল বহাল থেকেছে। বনিবনাও না হবার কোনো কারণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

—তবে উনি অত উতলা হয়ে উঠলেন কেন?

—সে একমাত্র উনিই বলতে পারেন। ওঁর মনের খবর আমার জানা নেই। মজুর-মিস্ত্রী আর কনট্রাক্ট-দেনেওয়ালা বড়কর্তাদের মনের খবর রাখতে আর মন জুগিয়ে চলতেই আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ওঁর মন কেন জগতের আর, কোনো কিছুর খবরই রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে ও-বাড়ীর কারুর সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, ঝগড়াঝাঁটি ও করতেই জানে না। কি বললেন? না তাঁদের আর্থিক কোনো অসুবিধে ঘটেনি। বাড়ী আমার নামে ভাড়া নেওয়া, বাড়ীভাড়া ইলেকট্রিক বিল আগের মত আমিই দিয়ে যাচ্ছি, দাদার বড় ছেলেটাকে কাজ শিখিয়ে চার আনার অংশীদার করে নিয়েছি, রান্নাবান্না কাজের ভার অনেকদিন ধরেই একটি আশ্রিতা মহিলার ওপর ছিল, এখনও আছে। দাদার ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে, তাদের দেখাশোনার দায়-দায়িত্ব নেই। মায়ের অসুখের সময় তাঁর সেবা করতে আমার বিধবা এক মাসী এসেছিলেন। তিনিই কমলার পোস্টে বহাল হয়েছেন। বৌদির অসুখের জোয়ার-ভাঁটা খেলে না। যখন বড়ঘরের কোনো কাজকর্মের জন্য বাড়তি টাকা-পয়সার দরকার হয় কমলাই আমাকে তাগিদ দিয়ে আদায় করে ও বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। না অন্য কোনো দিক দিয়ে এখন আর কারুর কোনো অভিযোগ নেই। ছোট ভাই-এর সঙ্গেও কোনো গোলমাল নেই। হ্যাঁ সে মাঝে মাঝেই আমার গড়িয়ার বাড়ীতে আসে। সবই ঠিক আছে, বদলেছে শুধু কমলা। ছোট ভাইয়েরই তাগিদে আমি আপনার কাছে এসেছি। তার মতে এটা অন্য কোন রোগ। রজঃরোধের উপসর্গ হলে এতদিন ধরে চলবে কেন? আপনার কি মনে হয়? সারবে তো? ওকে এইবার আপনি জিজ্ঞাসা করুন কেন ও সব সময় মুখ ভার করে থাকে? বল, ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল। আমি থাকব না যাব? আমি বরং বাইরেই বসছি। তোমার যা বলবার তুমি একান্তেই বল।

—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলে শ্যামলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

মুখ তুললেন মিসেস হাজারী। বড় বড় চোখ দুটোতে বিষাদের ছায়া; মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো. ফ্যানের হাওয়ায় সামনের দু-একগাছা চুল উড়ে এসে মাঝে মাঝে কপালে পড়ছে। কালো রঙের শাড়ীর অগোছাল আঁচলটা সামনে নিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামালেন। চোখের পাতাগুলো বেশ বড়, চোখ নামাতে মনে হল যেন চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছেন। ভাল করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে হল বুঝি এই রকম কোনো মূর্তি দেখেই মিলটন লিখেছিলেন, কাম পেনসিভ্ নান ডিভাউট এ্যাণ্ড পিওর। সত্যিই ধ্যানমগ্না সন্ন্যাসিনীর মত দেখতে। এক শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র মূর্তি। মনে হল না এই মহিলার জীবনে কোনো সমস্যা আছে আর যদিও থাকে তবে সে সমস্যার সমাধান আমাদের মত চিকিৎসকের সাধ্যের বাইরে। কি কথা দিয়ে আলাপ শুরু করব কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে মিসেস হাজারীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় বললেন :

—আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনন্দ আনতে পারছি না। কিছুতেই কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে মনে হয় পা দুটো এত ভারী যে আমি নাড়তেই পারব না, হাত তুলতে গেলে মনে হয় যে হাত দুটো যেন আমার নয়। আমার দেহটা যেন শিষে দিয়ে তৈরী। কথা বলতে কষ্ট হয়, বুকের ভেতরটা ফাঁকা অথচ মাথাটা ভারী। কী আমার দুঃখ কী আমি চাই—আমি নিজেই জানি না। মনে হয় আমার ওপর যে দায়িত্বভার ছিল যে তা আমি পালন করতে পারিনি। আমি বোধহয় কোনো অন্যায় করেছি. ঘোরতর অন্যায়। তাই শাস্তি পাচ্ছি। আমাকে এমন কোনো ওষুধ দিন যাতে আমি কথা বলতে পারি। আমার দেহের সব রক্ত জমে গেছে, তাই বোধহয় দেহে

কোনো সাড় নেই, আমার স্নায়ুগুলো সব শুকিয়ে গেছে—তাই নড়াচড়া করতে গেলে কষ্ট হয়। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আর কিছু বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন আমার এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী আর কেউ নয়। আমি বোধহয় আর ভাল হব না, বোধহয় ভাল হতে চাইও না।

সত্যিই ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। আমি ওঁকে শবাসনে রিল্যাকস করার পদ্ধতি শিখিয়ে কিছু ওষুধপত্র দিয়ে সেদিনকার মত বিদায় দিলাম।

পরের দিনই মিসেস হাজারী আবার এলেন। শ্যামলবাবু ছোট ভাইকে বসিয়ে রেখে নিজের কাজে চলে গেলেন। এবার তাঁকে দেখে মনে হল একটু যেন উন্নতি হয়েছে, বোধহয় ওষুধের ফল। কিন্তু ওঁর কথা শুনে আমার ভুল ভাঙল, চমকে উঠলাম।

—আপনার ওষুধে কোনো কাজ হল না। দিনে তিনটে করে খেয়ে কাজ হবে না ভেবে কাল একসঙ্গে সব কটা বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। ঘুমতো হলই না সারারাত জেগে রইলাম; গায়ে জ্বালা, মাথায় যন্ত্রণা। সারারাত ছটফট করলাম। অবশ্যি খাওয়ার পরেই বমি হয়ে গেছল, হয়তো বড়িগুলো বমির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। ওঁদের বাড়ীর ডাক্তারতো তাই বললেন।

শ্যামলবাবুর ছোটভাই-এর দিকে তাকিয়ে বললাম—কী করে উনি ওষুধ পেলেন? আপনার দাদাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, ওষুধ যেন ওঁর নাগালের মধ্যে না থাকে। তিনি যেন নিয়মিত নিজের হাতে ওঁকে ওষুধ খাওয়ান—আমার প্রেসক্রপশনেও একথা স্পষ্টভাবে লেখা ছিল।

তিনি কিছু বলার আগেই মিসেস হাজারী বলে উঠলেন: উনি যে ড্রয়ারে ওষুধ রেখেছিলেন তার একটা চাবি আমার কাছে ছিল। ওঁর কোনো দোষ নেই। তবে একটা উপকার হয়েছে আপনার ওষুধে। আমার বুকের ভারটা কমে গেছে, সারা দেহে অস্থির অস্থির কেমন একটা ভাব দেখা দিয়েছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অনেক

কথা বলবার ইচ্ছে। আপনার শোনবার সময় হবে কি? অমল তুমি একটু বাইরে যাবে?

অমল বাইরে যেতেই মিসেস হাজারীর ভাবান্তর ঘটল। তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। সোফায় দেহ এলিয়ে চোখ তুলে সিলিং দেখতে লাগলেন।

—কি বলবেন বলুন। আমি প্রস্তুত, সময়ও আমার যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ বলুন।

প্রথমটায় কোনো সাড়া দিলেন না কমলা হাজারী। আমার কথা তাঁর কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। আবার তাঁকে সম্বোধন করে আগের কথাগুলো উচ্চারণ করলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। তারপর তিনি ঐভাবেই আপন মনে বলে যেতে লাগলেন: আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। এখনও দেখছি: ঐতো মঠের সন্ন্যাসিনীরা আমার মৃতদেহটা একটা সৎকার সমিতির গাড়ীতে তুলেছে। গাড়ী চলেছে ওরা আমার শবদাহ করবে না জানি। কিন্তু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে না কেন? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে! মাথার ওপর অনেকগুলো শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওটাতো ভাগাড়। কেয়াঝোপের মধ্যে কেউটে লুকিয়ে আছে। কেয়া ফুটেছে তাই সাপ এসেছে। শকুনিরা প্রথমে চোখ দুটো তুলে নেবে তারপর বুকের নরম মাংস। না! বুকতো শুকিয়ে গেছে। শকুনিরা খালি চক্রাকারে ঘুরছে। সন্ন্যাসিনীরা কালো আলখাল্লায় মাথা মুখ ঢেকে ফিরে যাচ্ছে। কেয়াফুলটা আমাকে কে এনে দিল? কেউটে নয় গোখরো। ফণা বিস্তার করে শকুনিদের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাবে। সরাসরি শ্মশানেশ্বরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। শাশুড়ি ঠাকরুনকে আমি মেরে ফেলেছি........

এই অবধি বলে হঠাৎ ওঁর সম্বিত ফিরে এল। ধড়মড় করে উঠে

এসে আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। লক্ষ্য করলাম—আজ ওঁর চুল অবিন্যস্ত ও মুখে যত্নহীন প্রসাধনের চিহ্ন।— ভাবছেন আমি মরতে ভয় পাই? মোটেই না। তবে আমি সুন্দরভাবে মরতে চাই, হাসতে হাসতে মরতে চাই মবে পুড়ে ছাই হতে চাই। সেই ছাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে চাই। নিজের চিতাভস্ম নিজে ভাসিয়ে দেবার আনন্দ মা কালী আমাকে দেবেন না। আমি যে অনেক পাপ করেছি। —একটু চড়া সুরে কথাগুলো বললেন।

—কি আবার পাপ করলেন? আমি যতদূর জেনেছি আপনি নিষ্পাপ। না কোনো পাপ করেননি আপনি।

আবার ভাবান্তর। কণ্ঠস্বরে আর উত্তেজনা নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন:

—আপনি বলেছেন আমি পাপ করিনি! আমার শাশুড়ী আমার জন্যে মরেননি! উনি যে আমাকে বলেছিলেন, উনি যতদিন বেঁচে আছেন আমরা যেন আলাদা বাড়ী না করি। মেজছেলে ওঁর কথা নাও শুনতে পারে তাই ভেবে আমাকে বলেছিলেন। আমি আমার স্বামীকে সেকথা জানাইনি। জানলে স্বামী কিছুতেই বাড়ী করতেন না আর উর্মিরও অমন করে কপাল পুড়ত না।

—উর্মি কে? কি হয়েছে তার?

—উর্মি? আমার বড় মেয়ে উর্মিলা। নতুন বাড়ীতে গিয়েই ওর বিয়ে দিই। খুব ভাল ছেলে খুব ভাল; ইঞ্জিনীয়ার, বিলেতে কাজ করে। ঐ ভাল ছেলের সঙ্গে উর্মির বনিবনাও হল না। সেতো আমার পাপেই। শাশুড়ীর অভিশাপে উর্মির কপাল পুড়েছে। দু-বছরের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে উর্মির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বিলেতেই ডাক্তারী করছে উর্মি। কী কষ্টে যে দিন কাটাচ্ছে—আমি ছাড়া কেউ বোঝে না। ওর কথা গোপন করে সুমির, আমার ছোট মেয়ে সুমিতার বিয়ে দিয়েছি। ওরা একদিন সব জেনে যাবে। সেদিন সুমিকে ঠিক বাড়ী থেকে ওরা তাড়িয়ে দেবে। আমারই দোষ।

আমি ওদের জ্যাঠা, কাকার সঙ্গে থাকতে দিইনি। তাহলে ওরা এমন হত না এত কষ্ট পেত না। কিন্তু ঐ বাসা না ছেড়েও আমার উপায় ছিল না। শাশুড়ী ঠাকরুণ মরার পর রোজ রাত্রে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। কেন আমি মেজছেলেকে বাড়ী করতে বাধা দিলাম না?

শ্মশানকালীর বেশ ধরে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। আমারতো ইচ্ছে ছিল বাড়ীটা হচ্ছে হোক। বাগান আছে খোলামেলা জায়গা আছে ছুটি-ছাটাতে সবাই মিলে গিয়ে থাকব। বাসা ছাড়বার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। ভয়ে আমাকে পালাতে হল। কোনো লোককে একথা বলিনি, সকলে জানে আমি আরাম চাই বলে আলাদা বাড়ীতে উঠে গেছি। মোটেই না। বরং এখানে এসে কাজ করতে না পেরে ঝক্কিঝামেলা সামাল দেবার দায়িত্ব না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—ওখানে গিয়ে বুঝি আর ভয়ের স্বপ্ন দেখেন নি।

—প্রথমদিকে দেখিনি। উর্মির কপাল পোড়ার পর থেকে আবার দেখছি। কখনো দেখি উর্মি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, কখনো দেখি সুমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করছে, কখনো দেখি মেজমেয়ে কমুকে তার শাশুড়ী বিষ খাইয়েছে। একদিন দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখলাম ঘুষ দেবার অপরাধে আমার স্বামীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।··· আমাকে আপনি ভাল করতে পারবেন না। কেউই পারবে না। অসুখ তো নয় পাপ। অসুখ ভাল করা যায়, পাপতো খণ্ডানো যায় না। তবু মরতে ভয় করে। মরলে যমরাজ আমাকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেবে, করাত দিয়ে আমাকে চিরবে। তাই মরতে ভয় করে। আমাকে বরং কোনো মঠে পাঠিয়ে দিন। সেখানে আমি আতুরের সেবা করব, কুষ্ঠরোগীর পরিচর্চা করব নিজের খাবার থেকে অর্ধেক রাস্তার ভিখিরীকে খাওয়াব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি মরতে চাই না। আমি মরবার জন্যে আপনার বড়িগুলো

খাইনি তাড়াতাড়ি ভাল হবার জন্য খেয়েছিলাম। আমি একলা থাকতে ভয় পাই। স্বামী দিন-রাত বাইরে বাইরে থাকেন। চাকর-ঝিয়ের ওপর আমার ভরসা নেই, ওরাতো বুঝতে পারে আমি পাপ করে অনুতাপ করছি। ওরা আমাকে কৃপার চোখে দেখে। আমার একটা উপায় করে দেবেন তো ডাক্তারবাবু? আপনি ছাড়া আমার পাপের কথা কেউ জানে না। কিন্তু আপনার কাছে এত কথা বললাম—তবু তো বুকের ভার নামল না। আবার শরীর ভারী হয়ে আসছে, হাত-পা অবশ হয়েছে, গলার ভেতর কে যেন শিষে ঢেলে দিচ্ছে—বলতে বলতে সহসা থেমে গিয়ে আবার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে লাগলেন মিসেস হাজারী।

পরে শ্যামলবাবুর কাছে জানলাম বড় মেয়ের ব্যাপার। স্বামী বিলেতে একটি ভিনদেশী মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে বাস করছিল। মেয়ে ওখানে গিয়েই বুঝতে পারে বিদেশিনীর সঙ্গে বিয়ে না হলেও তার প্রতিই স্বামীর বেশি আকর্ষণ। তাই বাপ-মাকে জানিয়েই ও আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ওর মায়েরও এতে সম্মতি ছিল।

যৌথ পরিবারের ছত্রছায়ায় থাকলে হয়তো কমলার বিষণ্ণতা রোগ দেখা দিত না। যৌথদায়িত্ববোধ চলে গেলে ব্যক্তিগত পাপ-বোধ সহজেই জেগে উঠতে পারে। কমলার এখন প্রথম প্রয়োজন বাড়ীর সকলের সঙ্গে একত্রে থাকা, একথা শ্যামলবাবুকে জানিয়ে দিলাম। তিনি দাদা ও ছোট ভাইকে রাজী করালেন। সকলে একসঙ্গে গড়িয়ায় থাকার ব্যবস্থা হল। কমলার তথাকথিত মেনোপোজাল সিনড্রোম রজঃরোধের উপসর্গ ক্রমশ দূর হয়ে যাবে—এই আশ্বাস দিলাম তাঁর স্বামীকে। আর কমলাকে বললাম—তিনি বাড়ীর লোকের সেবার মধ্য দিয়েই শুচি-স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে উঠতে পারবেন।
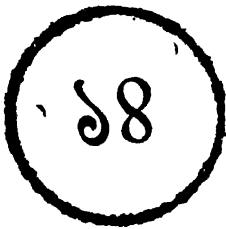
"There's nought in this life sweet.
If man were wise to see't.
But only Melancholy.
O Sweetest melancholy "....Ptetcher

কিছুতেই সত্যকে অফিসে পাঠানো যাচ্ছে না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেও আবার কিছুক্ষণ শুয়ে বসে কাটায়, তারপর দুপুরের পর থেকে একটু ভাল বোধ করে। এই সময় খাওয়া-দাওয়া করে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়, বাড়ীর লোকদের দু'একটা কথার জবাব দেয় ওষুধপত্তর খেতে চায়। সন্ধ্যের দিকে মনমেজাজ প্রায় ঠিক হয়ে আসে। কিন্তু আবার রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে অস্বস্তি, কিছুতেই ঘুম আসে না, প্রায় রাত দুটো নাগাদ তন্দ্রা আসে, তন্দ্রার ঘোর কাটতে না কাটতেই সকাল হয়ে যায়। গত চার পাঁচ বছর ধরে বছরে একবার করে এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ওষুধপত্রে বিশেষ কাজ হয়নি প্রতিবারই বৈত্যুতিক শক্ (ই সি টি) দিতে হয়েছে। প্রতি বছরই এই অবস্থার জন্য তার প্রায় মাসখানেক করে অফিস কামাই হয়েছে। অন্যবারে চিকিৎসার পর বছরখানেকের

মত ভাল থাকত, এবার মাস ছয়েকের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন ও বিষাদ রোগে (ডিপ্রেসনে) ভুগছে। এই বিষাদ রোগ কেন হয় ? এ-কি সারবার অসুখ নয় ?

সত্য সেনের বৃদ্ধ পিতা মণিবাবু ছেলের অসুখের বিবরণ শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। মনিবাবুকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। দেশ ভাগের পরই পশ্চিমবঙ্গে আসেন। নামকরা একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ; এখানে এসে কলকাতার উপকণ্ঠে এক উদ্বাস্তু কলোনীতে একটি স্কুল গড়ে তোলেন। সত্য তখন বছর পাঁচেকের ছেলে। তুটি কিশোরী মেয়ে, সত্য আর স্ত্রী—এই নিয়ে সংসার। মণিবাবুব অনেক কৃতী ছাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের অর্থ সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যেই মেয়ে তুটিকে পাত্রস্থ করে মণিবাবু স্কুল আর সত্যকে নিয়ে মেতে ওঠেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটি অনুমোদন লাভ করে এবং ঐ তল্লাটের একটি উচ্চমানের স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই স্কুল থেকে সত্য কৃতিত্বের সঙ্গে যেবার স্কুল ফাইনাল পাশ করল সেবারই উপদলীয় কলহের ফলে মণিবাবুকে স্কুলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল। শুধু তাই নয় স্কুল-সংক্রান্ত মামলামোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে কোনোমতে সম্মান বজায় রেখে বেরিয়ে আসার পর তিনি মনের অসুখে ভোগেন। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়. ভদ্র-লোকের নানাবিষয়ে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ আছে সে সময় জেনেছিলাম। তাঁর অসুখের চিকিৎসা প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। ছেলের ব্যাপার নিয়ে কেন এতদিন তিনি আমার পরামর্শ নিতে আসেননি জানতে চাইলাম। উত্তরে শুনলাম যে ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বাতের অসুখে পঙ্গু আর্থিক সঙ্গতি কিছু নেই। ছেলেরও বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না বাপের চেনাজানা চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করার। বাপের ওপর বিশেষ আস্থা

নেই। কিন্তু এখন সে শ্বশুরবাড়ীর লোকদেরও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। চিকিৎসক বদলে সেই আগ্রহ দেখিয়েছে, তাই মণিবাবুকে অশক্ত দেহ নিয়েও আমার কাছে আসতে হয়েছে।

– ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে জানা দরকার, ছেলেকে পরীক্ষা করা দরকার তার সঙ্গে কথাবার্তারও প্রয়োজন আছে। রোগ কেন হয়েছে সারবে কি না—এ সব প্রশ্নের উত্তর তারপর হয়তো দিতে পারব। আবার সব জানার পরও অনেক সময় আমরা রোগের সঠিক কারণ ধরতে পারি না সারবে কিনা ঠিকমত বুঝতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রমানে মস্তিষ্কবিজ্ঞান এখনও অপরিণত।

মণিবাবুর মুখে সত্য সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম। তার সংক্ষিপ্ত-সার পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

সত্য স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্ট করে বৃত্তি পেয়ে কলেজে ভর্তি হবার সময়ই মণিবাবু মামলামোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন। নিজের ঝঞ্ঝাট সামলাতে তিনি এ সময় খুবই ব্যস্ত থাকার দরুন ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনো নজর দিতে পারেননি।

দারুণ অভাব অনটনের চাপে পড়ে সত্যকে সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়ানোর কাজ নিতে হয় এতে তার নিজের পড়াশুনার ক্ষতি হতে থাকে। যে রকম রেজাল্ট আশা করেছিল না হওয়াতে খুব মুষড়ে পড়ে। ওর ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনীয়ার হবে। প্রথম বিভাগেও পাশ করলেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হবার কোনো চেষ্টা করল না। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ারও খরচ চালাবার ক্ষমতা ওদের নেই ও বুঝতে পেরেছিল। এই সময়ও নাকি সারাদিন ঘরে বসে থাকত, বন্ধু-বান্ধব-দের সঙ্গে মেলামেশা করত না। বিজ্ঞানে ওর আসক্তি ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের লাইন ছেড়ে কমার্স ক্লাসে ভরতি হল। বাপের সঙ্গে এ নিয়ে বেশ কিছু বচসা ও মনোমালিন্য ঘটে। তবে সে সময় মণিবাবু নিজের মানপ্রতিপত্তি রাখার সংগ্রামে এত ব্যস্ত যে ছেলের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলেন না। অনেক কষ্টে মামলার জাল

ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সত্য তখন কমার্স গ্রাজুয়েট হয়েছে, ফলও বেশ ভাল করেছে। ওদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়, তাই বাধ্য হয়ে সত্যকে চাকরী নিতে হল এবং বাপের চিকিৎসা খরচ চালানোর জন্য মায়ের অনুরোধে বেশ মোটা টাকা পণ নিয়ে বিয়ে করতে হল। এই বিয়েতে ওর একেবারেই মত ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুর মশাই ওকে চাকরী ছেড়ে এক বড় অডিটারের ফার্মে শিক্ষানবীশ হতে বললেন। টাকা পয়সার সব দায়িত্ব তিনি নিতে চাইলেন। মণিবাবুর তখন মতামত দেবার মত অবস্থা নয়, তিনি ছেলেকে তার ইচ্ছামত চলার নির্দেশ দিলেন। সত্য শ্বশুরের প্রস্তাবে সাড়া দিল না। স্ত্রীর সঙ্গে ও শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে এর পর ওর সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে উঠল। ওর স্ত্রী তার ইচ্ছামত চলাফেরা করত, যখন খুশী বাপের বাড়ী চলে যেত, যখন খুশী আসত। শ্বশুর-শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়েই স্বামীকে তার দুর্বুদ্ধি ও অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য তিরস্কার করত। এ-সব কথার জবাব দিত না সত্য। জেদী ও একগুঁয়ে হলেও সত্য খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। মণিবাবুর সঙ্গে সেই কমার্স পড়বার ব্যাপার নিয়ে একবার যা-কিছু বাদানুবাদ করেছিল। এই রকমভাবে বছর পাঁচেক চলল। মণিবাবু সুস্থ হয়েছেন, সত্যও চাকরী ও টিউশনি করে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়েছে। আগের মত অভাব অশান্তি আর নিত্যসঙ্গী নয়। এমনি সময় একরাতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বচসা করতে শোনা গেল সত্যকে। মা-বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত উত্তেজিত কণ্ঠে সত্যকে কোনদিন ওঁরা কথা বলতে শোনেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে সত্য বেরিয়ে এল। কলঘরে গিয়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল। ঘরের মধ্যে ওর স্ত্রীর অস্ফুট কান্নার শব্দ শুনলেন মণিবাবু। তার পর দিনই সত্য অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বিষাদ-রোগের এই সূত্রপাতের বিবরণ শোনার পরদিন সন্ধ্যায় সত্যকে আর তার স্ত্রীকে নিয়ে মণিবাবু আমার কাছে আসেন।

সত্যশরণের স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেই বুঝলাম মেয়েটি অসহিষ্ণু প্রকৃতির অহঙ্কারী। সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলল: ও সেদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিল। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কম, কিন্তু ও-যে এরকম অসভ্যের মত ব্যবহার করতে পারে—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। পরের দিন ও-যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত, তবে আমি ওদের বাড়ীতে কিছুতেই থাকতাম না। শ্বশুরমশাইকে আমি দোষ দিই না। তিনি ইচ্ছে করে নিজের সর্বনাশ করেননি। ও-কিন্তু ইচ্ছে করেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বাবা ওকে কতরকমভাবে সাহায্য করতে চেয়েছেন ও সাহায্য নেবে না। ওর ধারণা আমার বাবার সাহায্যে কেরিয়ার গড়লে আমার কাছে ও ছোট হয়ে যাবে। কি বোকার মত কথা বলুন তো? সেই রাতে কি হয়েছিল? হ্যাঁ মনে আছে। আমি সেদিন খবর পাই যে অফিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় ও ফেল করেছে। এই পরীক্ষার কথা আমাকে জানায়নি ওর মা-বাপকেও বলেনি, অফিস সুপার আমার দাদার বন্ধু, তাঁর কাছ থেকে আমরা খবরটা পাই। না, কড়া কথা কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে ওপরে ওঠবার ক্ষমতা যার নেই তার আবার এত অহঙ্কার কিসের? এতেই ও একেবারে ক্ষেপে গেল। রেগে উগ্রমূর্তি ধরল। এর আগে ওকে এত রাগতে কখনো দেখিনি। আমার বাবা ওর উপকার করতেই চেয়েছিলেন; তাঁর সম্পর্কে যা-তা বলতে ওর একটুও আটকাল না। আমার বাবা নাকি 'ব্ল্যাক' করে পয়সা করেন, হিসেবের-কারচুপি আছে নাকি তাঁর ব্যবসায়! আমি ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নই। তাঁর নামেতো এ-পর্যন্ত কোনো জালজুয়াচুরির মামলা হয়নি—হ্যাঁ এই কথা আমি বলেছিলাম। এ-তো সত্যি কথা। একশোবার বলব। এই শুনে পাগলের মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলতে ও বোধ হয় খেয়াল ফিরে পেল। দরোজা খুলে বাইরে চলে গেল। তার পর সারারাত বোধ হয় ঘুমোয়নি। সকালে

ঘুম ভাঙতেই দেখি ওর চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। ও-আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে; বিড় বিড় করে বলছে আমারই দোষ আমিই অন্যায় করেছি আমার অহঙ্কারের জন্যেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। প্রথমটায় ভাবলাম বুঝি নিজের ভুল বুঝতে পেরে এতদিন পরে সত্যিই ওর অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু চোখমুখের অবস্থা দেখে আমার ভয় হল; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর মাকে ডেকে আনলাম।

সতশরণের স্ত্রী আরো জানাল যে অসুখের সময় সে স্ত্রী ও শ্বশুর-বাড়ীর অনুগত থাকে, তারা যা বলে সব শোনে ভবিষ্যতে তাদের ব্যবস্থা মত চলবে বলে কথা দেয়। কিন্তু যেই ভাল হয়ে অফিসে যেতে থাকে তখনই আবার অন্য মূর্তি ধারণ করে। সেই আগেকার স্বভাব ফিরে আসে। সেই পুরনো সঙ্কল্প ওর হাবভাবে প্রকাশ পায়। পারে তো নিজের চেষ্টায় বড় হবে! অন্যের সাহায্য নেবে না। নিজের কেরিয়ার গড়বে নিজেই।

এবার সত্যশরণের কথা:

বিষাদক্লিষ্ট রোগীদের বেশির ভাগের চোখেমুখে যে বিষণ্ণতার ছাপ থাকে সত্যশরণের মধ্যে তার অভাব দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম হয়তো বিষাদ পর্ব শেষ হয়ে আসছে। কথাবার্তার মধ্যেও অতিপরিচিত বিষণ্ণতার সুরের অভাব আছে—মনে হল। ছেলেটি সোজাসুজি বলল: আমার অফিস যেতে ভাল লাগে না, কাজ করতে ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। ক্যাশ লেজার পোষ্টিং—খুব একঘেয়ে লাগে। বলবেন কাজ করাতো দরকার। না হলে বাঁচব কি করে? ঠিক। সেই জন্য বারবার ডাক্তারের কাছে যাই। কর্তব্য হিসেবে যাই, নিজের ইচ্ছেয় যাই না। বেঞ্চে শুয়ে পড়ে মাথাটা যন্ত্রবিদের জিম্মায় ছেড়ে দিই। মগজের বিদ্যুৎ চলাচল ব্যবস্থার ঘাটতি কিম্বা বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। কোষগুলি অসাড় হয়ে পড়েছে। তাঁরা বাইরে থেকে

এনার্জি চালান দেন, ধাক্কা দিয়ে কোষগুলিকে চালু করে আমাকে অফিসে পাঠান। দৈনন্দিন রুটিনে বাঁধা পড়ে যাই। আবার সেই ক্যাশ-লেজার-পোষ্টিং-রিপোর্ট। আবার সেই মাস কাবারে মাইনে নিয়ে বাড়ী ফেরা। বছরে বছরে এমনি ধাক্কা মেরে মগজটাকে চালু রাখতেই হবে। নইলে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা উপোষী থাকবেন। তাঁদের প্রতি আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না।

এই ধরনের কথা 'ডিপ্রেশনের' রোগীদের মনে থাকলেও তাঁদের প্রকাশ করতে কম শোনা যায়। তাছাড়া ছেলেটির কথার মধ্যে যেন শ্লেষের ছোঁয়া ছিল। কথা বলার ভঙ্গীও 'ডিপ্রেশনের' রোগীর মত নয়। তারা সাধারণত 'হাঁ-না'— এই ধরনের এক অক্ষরের শব্দ দিয়েই কথা সারতে চায়।

—তুমি তো তোমার কাজ নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়েছ। তোমার বাবা জানতেন তুমি বিজ্ঞান পছন্দ কর তিনি তো তোমাকে সেই লাইনেই যেতে বলেছিলেন।

—আমরা অনেক সময় যেটা চাইনে সেইটেই পছন্দ করি, যে লাইনে যেতে অনিচ্ছুক সেই লাইনেই চলি। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে পছন্দ-অপছন্দের দাম কতটুকু? মনে হয়—অনেক পথই খোলা; কিন্তু চলতে গেলে দেখা যায় একটি মাত্র পথ আছে। অন্য পথে কাঁটা। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু নেই।

—অন্য লাইনে গেলে তোমার হয়তো কাজ ভাল লাগত, কাজে মন বসত, এই রকম ধাক্কা দিয়ে, ঠেলেঠুলে তোমাকে চালু রাখতে হত না।

— এখন সে কথা ভেবে কোনো লাভ আছে কি? আপনার যদি চালু রাখবার নতুন কোনো জাদু জানা থাকে দয়া করে আমাকে সেটা জানিয়ে দিন। আমি আমার বিষণ্ণতা দূর করতে চাই না, কোনো রকমে চালু থাকতে চাই।

—বিষণ্ণতা দূর করতে চাও না? জীবনে কোন কিছুই তোমার ভাল লাগে না?

না। খুব নিরেট বুদ্ধির লোক ছাড়া আর কারুরই এই জীবনটাকে ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছেয় এ জীবন আমি পাইনি, জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই আমার জানা নেই. জীবনে ভাল লাগার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু আমার নয়, সবার জীবনই একরকম একই ছাঁচে একই ছকে বাঁধা। আমি জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে এসব কথা বলছি না। যুদ্ধ আমি কোনদিন করিনি, করবও না। যারা জয়ী হয়েছে তারাও খুব সুখী হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঁচাটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তাই বেঁচে আছে। তারা হয়তো হাসে, তারা হয়তো গান গায়, কিন্তু তাদেরও জীবনটাকে ভাল লাগে বলে আমার মনে হয় না। আমি বাহবা চাই না, প্রশংসা চাই না, আনন্দ চাই না, শুধু কর্তব্য করতে চাই। আমাকে চালু করার কোনো মন্ত্র জানা থাকে তো বলুন। আমি বিদ্যুৎ-যন্ত্রের ধাক্কা খেতে খেতে অনেক বছর চললাম আর ও ভাবে চলতে চাই না। দেখি আমার অন্যভাবে চালু থাকার ইচ্ছে সফল হয় কিনা।.... মানুষের মনে যদি কোনোদিন সুবুদ্ধির উদয় হয় সেদিন সে এই অর্থহীন চলার রেস নিজেরাই সমবেত চেষ্টায় থামিয়ে দেবে। সেই সংকল্প যে-দিন মানুষ গ্রহণ করবে, সেদিন সে বুঝতে পারবে জীবনের সব থেকে বরণীয় ও কাম্য দেবতা হচ্ছেন বিষণ্ণতার দেবতা। তিনি সুন্দর, তিনি মধুর।

—তোমার এ-সব কথা মরবিড জীবন-বিদ্বেষী, এ্যান্টি-লাইফ; তুমি সুস্থ হলে, আর এ-সব চিন্তা তোমার মনে আসবে না।

—তাই তো আপনারা যে সুস্থতার কথা বলেন সে সুস্থতা আমি চাই না। আমি শুধু চালু থাকতে চাই, কর্তব্য করতে চাই।

পরের দিন মণিবাবুর সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে বললাম: আপনার পুত্রের প্রায় নাটকীয় সংলাপ শুনে বুঝলাম আপনারা ওষুধপত্র ওর

হেফাজতে রেখেছেন। কোনো অতি-উত্তেজক ওষুধ খেয়ে আমাকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছে। ওষুধ ওর মার কাছে রাখবেন, সময়মত যেন ওকে দেওয়া হয়। আর বুঝলাম আপনার ছেলে আধুনিক নাটক-নভেল পড়েছে অনেক, বোধহয় কিছু দর্শনের মনস্তত্ত্বের কেতাবও পড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হয় হজম করতে পারেনি, কিম্বা ওর আজন্ম সংস্কারের বর্ম ভেদ করে কেতাবের বুলিগুলি ওর মন স্পর্শ করতে পারেনি। আপনার অসুখের সঙ্গে ওর অসুখের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। 'ডিপ্রেশনই' বলব, তবে মাত্রা আপনার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রায় একই। আপনি সরল গ্রামীণ ধ্যানধারণা নিয়ে, আদর্শ-অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে, আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আপনার পুত্র আপনার সংগ্রাম ও পরাজয়ের সাক্ষী। আবার আপনার পরাজয় তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আপনার মত লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে আগে থেকে পরাজয় স্বীকার করে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আপনি গীতা পড়েন, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলাফল মানেন, প্রাক্তন, দৈব, ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস আপনার অহংকার অনেকখানি স্তিমিত করে রেখেছে। সত্যশরণের বেলায় সেটা ঘটেনি। সে শৈশব থেকে নাগরিক। নাগরিক-দর্শন, নাগরিক মূল্যবোধ, নাগরিক জীবনের সবকিছু আপনার চেয়ে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে অনেক বেশি। সে দৈবশক্তি, ঈশ্বরের করুণা, গতজন্মের কর্মফল বা ভাগ্যের দোহাই পেড়ে নিজের অসাফল্যের ব্যথাকে দূর করতে পারেনি। এই যুগের নাগরিক 'অহং' বোধ তার মধ্যে তীব্র। কিন্তু এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে অক্ষম। কাজেই তার দায়িত্ব, কর্তব্য, সাফল্য অসাফল্য—সবকিছুকে নিজস্ব বলে মনে করেছে, নিজেকে হীন, অক্ষম, অপদার্থ মনে হচ্ছে, আর তারই ফলে বাস্তব-জীবনের সবকিছু এড়িয়ে মাঝে মাঝে পালাতে চাইছে। তখনই

তার মধ্যে ডিপ্রেশনের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। যদি সে অনেকের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ এক করে দেখতে অভ্যস্ত হত, অথবা সমষ্টি ও ব্যষ্টির সম্পর্ক ঠিক মত অনুধাবন করতে পারত, তাহলে বোধহয় এই 'পিরিয়ডিক ডিপ্রেশনে' ভুগত না। এ-অসুখ আজকের নাগরিক জীবনের এক প্রধান অভিশাপ। এখানে প্রত্যেকে আমরা একা, একান্ত একা।

— সারবে না ? ও কি কোনো দিন আর আনন্দ খুঁজে পাবে না; সুস্থ হবে না ?

— পুরো আশা এখুনি আপনাকে দিতে না পারলেও, একেবারে হতাশ হবার কোনো কারণ দেখছি না। তবে ওর স্ত্রীরও চিকিৎসা দরকার। ওকে কিছুটা অন্তত বদলাতে না পারলে, সত্যশরণের জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।
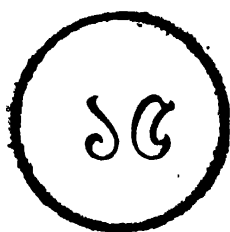
Haste thee, Nymph and bring
with thee
Jest and youthful jollity.
....
Sport that wrinkled care derides.
And laughter holding both his
sides
—Milton

—কি হয়েছে আপনার ?

—আমার আবার কি হবে ? আপনার কি হয়েছে বলুন। টাক পড়েছে, চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই কয়েক রাত ঘুম হয়নি! আচ্ছা আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুনতো ? আমার কাছে কি দরকার ? পরিচয়পত্র। তা, আমি আমার বন্ধুমহলে জানিয়ে দেব। আপনি এই শহরে প্র্যাকটিশ জমাতে চান—এই তো ? প্র্যাকটিশ জমাতে হলে সাজ পোষাক আর একটু ভাল করতে হবে, ঘরটাকে আর একটু সাজাতে গোছাতে হবে। আর সব থেকে বড় কথা টাকে চুল গজাতে হবে।

সে কিছু নয়। হেয়ার-গ্রাফটিং হামেশাই হচ্ছে। চিৎপুর থেকে একটা পরচুলো ভাড়া করলেও চলবে। মোটকথা ইউ মাষ্ট লুক ইয়ং অ্যাণ্ড স্মার্ট। ঐ বুড়ো-হাবড়া চেহারায় প্র্যাকটিশ জমবে না। আমার মত সুন্দরী মেয়েরা তো আসবেই না এমন কি ঐ এয়ার হোষ্টেস বা ওয়েট্রেসদেরও আপনার কাছে পাঠানো যাবে না... জানেনতো, আমার সঙ্গে কাল একটা সিনেমা কোম্পানীর কনট্রাক্ট সই হবার কথা ছিল। আমি রাজী হইনি—নায়কের ভূমিকায় আমার [illegible]মত অভিনেতা চাই। বোম্বেতে চলে যাচ্ছি...এখানে বড় হবার জো নেই। সব ডিরেকটরগুলো আপনার মত বুড়ো আর বোকা। একটা স্পেসস্যুট পেলে মঙ্গল গ্রহটা একবার ঘুরে আসতাম। আমেরিকার ওরা আমাকে অফার দিয়েছিল। কিন্তু এদিকে আবার এক বনেদী প্রকাশক আমার আত্মজীবনী ছাপানোর জন্য ধরে পড়েছে। একা মানুষ কোনদিক সামলাই বলুন তো? আবার ব্যালে দেখানোর প্রোগ্রাম রয়েছে মস্কোতে। ও হ্যাঁ, আপনি আমার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে চাঁদনীতে চলে যান। আপনার যা চেহারা রেডিমেড ব্লেজারেই আপনার চলে যাবে। পাগল বানিয়ে চিকিৎসা করতে চাও তো কামস্টাটকাতে চেম্বার খোলো, কলকাতার লোকরা তোমার ভাঁওতাতে ভুলবে না। এখন আবার সব রেষ্টুরেণ্টে মরা গরুর মাংস থেকে কাটলেট বানাচ্ছে। যাবার আগে কলেরার ইনোকুলেশন নিতে ভুলবে না। আর হ্যাঁ, একটা বিশেষ মুদ্রা শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা জানা থাকলে তুষার মানবই হোক আর ডায়নোসরই হোক—তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই বলে শ্রীযুক্তা পাল চেয়ারের ওপর উঠে....দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার ওপর তুলে, বাঁ হাত কোমরে দিয়ে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে আমাকে মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। তার পর শুরু হল হাসি। প্রথমে মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছুটছিলো, এবার হাসির ফোয়ারা। হাসি আর থামে

না। দুহাতে পাঁজর চেপে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার থেকে নেমে পাশের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন অঞ্জনা পাল।

অপ্রস্তুত মুখ করে স্বামী প্রকাশ পাল আমার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন : কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমার বাবার সামনে ও হাসছে, গান গাইছে। এমন কি মাঝে মাঝে অশালীন আচরণ, অসঙ্গত কথাও বলছে। কাল রাত্রে ডাক্তারবাবু মানে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান দুটো ইনজেকশন দিয়েছিলেন; ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আবার সেই চেঁচামেচি, হাসি গান; মাঝে মাঝে ঐ বিকট নাচের মহড়া। আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।

স্বামীকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে অঞ্জনার হাসি থামল। হাসির বদলে চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। এবার খাটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে রোষদীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চললেন, বীররসের নানা কবিতার পংক্তি। অসংলগ্ন অসম্পর্কিত। আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে!' তারপর একটু শান্ত হয়ে মেঝেতে নেমে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে গম্ভীর গলায় রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু আবৃত্তি করলেন : নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিলে অধিকার। হে বিধাতা—ইত্যাদি।

অঞ্জনা পালের বয়স বত্রিশ। অবাঞ্ছিত মেদবৃদ্ধি সত্ত্বেও বোঝা যায় এক সময় সুঠাম দেহশ্রীর অধিকারী ছিলেন। মুখের চেহারা মাত্রাতিরিক্ত 'মেক-আপের' আড়ালে ঢাকা। সেজেছেন পুরনো দিনের বাইজীর সাজে। শাড়ী ওড়না ইত্যাদিতে চোখ ঝলসানো রংয়ের সমারোহ।

এই ধরনের সাজগোজ ও এইরকম সংলাপের সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকই পরিচিত। নাটক নভেলে ক্ষিপ্ত রমণীর এই ছবি, উন্মত্ততার

এই প্যাটার্ণ অনেক দিন ধরেই চালু। ইংরেজিতে এই অবস্থাকে বলা হয় 'ম্যানিক ষ্টেট'। 'ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস' রোগের উপসর্গ—এই ক্ষিপ্ত অবস্থা বিষণ্ণতার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। কিছু রোগীর মধ্যে বারবার বিষণ্ণতার প্রকাশ দেখা যায়, কারুর মধ্যে আবার শুধু এই ম্যানিক বা ক্ষিপ্ত অবস্থারই অভিব্যক্তি ঘটে বারবার। মস্তিষ্কের বিশেষ টাইপ ও পরিবেশের বিশেষ সমাবেশের সঙ্গে উপসর্গের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কিত। রোগবিজ্ঞান ও নিদানতত্ত্বের আলোচনায় অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা, তাই আমরা কেবলমাত্র রোগীর ইতিহাস সাধারণের বোধগম্য করে বিবৃত করতে চাই। রোগীর কারণ এই সব ইতিহাস থেকে অনেকটা বোঝা যাবে। ব্যক্তিমানসে সমাজের রীতিনীতি বিধিনিষেধের প্রভাব কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানা থাকলে মনের অসুখের প্রতিবিধান ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠকসাধারণ কিছুটা অন্তত সচেতন হতে পারবেন। মনের অসুখকে কেন্দ্র করে অবাস্তব এবং রহস্যময় বহুরকমের ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়ে থাকে। রোগ-ইতিহাসে যদি রোগের কারণ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা যায়, তাহলে মনে হয়, এই ক্ষতিকারক অবাস্তব ধ্যানধারণার আংশিক নিরসন ঘটতে পারে। এইবার প্রকাশবাবুর মুখে অঞ্জনার কথা শুনুন।

—গত কয়েকদিন ধরেই অঞ্জনা বেশি কথা বলছিল। প্রায় সারারাত ধরে বকবক করাতে পরশুদিন আমাদের পাড়ার পরিচিত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। তাঁর কাছে গিয়ে অঞ্জনা বলে ও বেশি কথা বলছে না, ঘুমও ঠিকমত হচ্ছে। আমি নাকি ওর কথা বন্ধ করতে চাই, কেন না ওর কথার মধ্যে আমার কাজের ও চরিত্রের সমালোচনা ছিল। সেই সমালোচনা আমি সহ্য করতে পারছি না বলে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে চাই। ডাক্তারবাবু ওকে অনেকদিন ধরে চেনেন। অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কয়েকটা বড়ি খেতে

রাজী করালেন। কিন্তু কোনো কাজ হল না। বরং সেই রাতে ওর বাক্য-স্রোত আরো বেড়ে গেল। আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগল। উঁচু গলায় গান ধরল। পাশের ঘর থেকে বাবা উঠে এলেন। তাঁকে এমনিতে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাঁকে দেখে গানতো থামালোই না, বরং তাঁকে সমঝদার শ্রোতা ঠাউরে চোখের ইশারায় স্বাগত জানালো। তিনি বেশ কিছুটা লজ্জিত বোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, তারা যা-তা ভাবছে—এই সব কথা বলে অনেক অনুনয় বিনয় করে ওকে শান্ত হতে বললাম। ওর অনুযোগ অভিযোগের মাত্রা বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল কণ্ঠস্বরের তীব্রতা। উপায়ন্তর না দেখে বলপ্রয়োগে বাধ্য হলাম। জীবনে প্রথমে ওর গায়ে হাত তুললাম। আমার সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তি করে ঝিমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা তিনেক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। দরজায় তালা লাগিয়ে আমি বাইরের ঘরের সোফায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সকালে কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু এসে জোর করে একটা ইনজেকশন দিলেন, বিকেল পর্যন্ত শুয়ে রইল। সন্ধ্যায় আরো-দুবার ডাক্তারবাবু এলেন; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলে আর একটা ইনজেকশন দিয়ে বিদায় নিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হল না। ঘণ্টা দেড়েক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। তারপর সকাল হতে ঐ অদ্ভুত সাজগোজ করে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তারপর ওর দাদার সাহায্যে প্রায় ধরে বেঁধে আপনার এখানে এনে হাজির করেছি। গাড়ীতে উঠে আপনার নাম শুনে অনেকটা শান্ত হল। একদিন আপনি ওর অভিনয় দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন, সে কথা ওর মনে আছে। সে-প্রায় বারো বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। অঞ্জনার দাদাকে তো আপনি জানেন—নিরঞ্জন শর্মা; সে বাইরের ঘরে বসে আছে।

মেয়েটিকে প্রথম থেকেই চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। প্রকাশের কথা

শুনে পুরণো কথা মনে পড়ল। একবার বিশেষ অনুরোধে অঞ্জনার দাদার লেখা একটা নাটক দেখতে হয়েছিল। শহরতলীর একটা ছোট গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকার-পরিচালক নিরঞ্জন রায় তার নাটকের পাণ্ডুলিপি শুনিয়ে আমার কাছে কিছু মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত উপদেশ চেয়েছিল। নাটকটি আমার ভাল লেগেছিল, মেয়েটির অভিনয়েও সত্যিই অভিনবত্ব ছিল। থিয়েটারের দলটি কিছু দিনের মধ্যে ভেঙ্গে যায়। নিরঞ্জন বা অঞ্জনার খবরাখবর বহুদিন পাইনি। আজ আর এক নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা। সেই নাটকেও মনে পড়ছে, এমনি একটা দৃশ্য ছিল।

অঞ্জনা তখনও অসংলগ্ন আবৃত্তি করে চলেছে। মন দিয়ে তার আবৃত্তি শুনতে ও তার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখন উগ্রতা কিছুটা কম। কণ্ঠস্বরও খাদে নেমেছে। ডাক্তারী পরিভাষায় একে বলা চলে 'হাইপোম্যানিয়াক' অবস্থা। অঞ্জনা বলছিল "শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও। পঙ্ককুণ্ড হতে। মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে। বজ্রের আলোতে। তার পর ফেলে দাও, চূর্ণ করে যাহা ইচ্ছা তব—ভগ্ন করো পাখা। যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল, ছিন্নভিন্ন শাখা।" পরক্ষণেই শুনলাম: "বলে দে আমায় কি করিব সাজ, কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ, পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস।"

অঞ্জনা একটু থামতেই সেই নাটকের প্রসঙ্গ তুললাম। এর আগে আমার নির্দেশে নিরঞ্জন এঘরে এসেছে, আমার সঙ্গে দুচারটে বাক্য-বিনিময় ঘটেছে। নাটকের কথা তুলতেই অঞ্জনার ভাবান্তর ঘটল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল—কুইট ইণ্ডিয়া। প্রকাশ আমার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার অনুত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বলল—আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, ভেবেছিলেন বুঝি শাঁসালো মক্কেল বাগিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি শাঁসালো বটে কিন্তু আপনার মক্কেল নই। আপনার মক্কেলকে ওঘরে পাঠিয়েছি। ওর

ঘুম দরকার, ইনজেকশন দরকার, তারপর দরকার হবে মগজ পরিবর্তন, ব্রেইন ট্রান্সপ্লানটেশন। আমি ইচ্ছে করলে ওকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারি কিন্তু আমার সময় নেই। অনেকগুলো কনট্রাক্ট-এ সই করতে হবে। না, থিয়েটার আর করব না। দু-চারশো লোকের সামনে নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে আমার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে। সিনেমা আর টেলিভিশনের কনট্রাক্ট ছাড়া আর কিছুতে আমার ইনটারেষ্ট নেই। কিংবা আমাদের লুপ্ত প্রায় বাইজি নাচকে আবার জাগিয়ে তুলব। কথাকলি ভারতনাট্যম তলিয়ে যাবে। আপনার মক্কেলের ঘাটতি হবে না। ঐতো ক্ষুদে পালকে পেলেন, বাড়ী থেকে ওর বাবা গোদাপালকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসুন। আর সব নাচের স্কুলে টাউট পাঠান। অনেক মক্কেল হবে। নাচ দেখবেন ?

—তোমার কথামত সব ব্যবস্থা হবে। আপাতত এই শরবতটা খেয়ে নাও ; তারপর তোমার বাইজি নৃত্যম দেখা যাবে।

ওকে আর ওর দাদাকে দু গেলাস শরবত দেওয়া হল। দাদাকে খেতে দেখে অঞ্জনা এক চুমুকে গেলাসের ওষুধ মেশানো শরবত শেষ করে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত আধাঘুমন্ত অবস্থায় কনট্রাক্ট সই করার নাম করে ওর দাদার সঙ্গে ওকে অতি সহজেই তার বাসায় পাঠান গেল।

এরপর দুদিনের মধ্যে অঞ্জনার দাদা আর স্বামীর কাছ থেকে তার রোগ ইতিহাসের বিবরণ জানলাম। দুজনের বিবরণে কিছু কিছু গরমিল ছিল, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ছিল, ভুল বোঝা-বুঝির ব্যাপার ছিল। সেই সব বিচার বিশ্লেষণ করে অঞ্জনার অসুখের কারণ সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা আপনাদের জানাচ্ছি।

নিরঞ্জনের নাটকের দলে ভাঙ্গন ধরিয়ে প্রকাশ পাল তার নিজের দল গড়ে তোলে। নিরঞ্জন সরকারী অফিসের সামান্য কেরানী আর

প্রকাশ পাইপ মার্চেন্ট ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। নিরঞ্জন নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আমদানি করতে চায় আর প্রকাশ চায় নৃত্যনাট্য ও অপেরাধর্মী নাটক করতে। প্রথমদিকে প্রকাশ নিরঞ্জনের সহযোগী হয়ে তার নির্দেশ মত কাজকর্ম করেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমশ দুজনের মধ্যে রেষারেষি মন কষাকষি শুরু হল। প্রকাশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা নাচের স্কুল সে সময় বেশ নাম করেছিল। সেই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অঞ্জনা প্রথম নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে। নিরঞ্জনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্জনা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নিরঞ্জন সভা ডেকে প্রকাশ ও অঞ্জনাকে তাদের গ্রুপ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব নিয়ে আসে। অঞ্জনা ও প্রকাশ চলে গেলে তাদের দল টিকতে পারে না জেনে অন্য সবাই এই প্রস্তাব সভায় তুলতে দিল না। অঞ্জনা তাদের একমাত্র মেয়ে আর্টিস্ট আর প্রকাশ কোষাধ্যক্ষ ও ব্যাঙ্কার। নিরঞ্জন পদত্যাগের হুমকি দেখাতে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। এই সুযোগে প্রকাশ নতুন দল গড়ল ও জাঁকজমক করে নতুন নৃত্যনাট্যের মহড়া দিতে লাগল। পিতার অবর্তমানে নিরঞ্জনের মা ছেলেমেয়ের অভিভাবক। তিনি অঞ্জনাকে প্রকাশের দলে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন। নিরঞ্জনের ধারণা প্রকাশের কাছ থেকে বিশেষ ইঙ্গিত পেয়েই মা রাজী হয়েছিলেন। নিরঞ্জন বাড়ী ছেড়ে গড়িয়ায় এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিল ও নতুন করে দল গড়বার চেষ্টা করতে লাগল। নিরঞ্জনের ধারণাই শেষপর্যন্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন হল। ধনীপুত্র প্রকাশের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হল। মাতৃহীন পুত্রের খেয়ালে পিতা বাধা দিলেন না। মায়ের সাধ্যসাধনাতে নিরঞ্জন বিয়েতে যোগদান করল বটে কিন্তু প্রকাশ ও অঞ্জনাকে ক্ষমা করতে পারল না। ওরা সুবিধাবাদী—কেরিয়ারিষ্ট। নিরঞ্জন ওরকম বোন ভগ্নীপতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজী হল না। দু বছরের মধ্যে মা মারা গেলেন। এই সময়টায় সারা দেশ জুড়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হিংসাত্মক

সংঘর্ষ চলছিল। পাড়া ছেড়ে নিরঞ্জন অন্য কোথাও চলে গেল। বোন ভগ্নীপতির খবর মাঝে মাঝে পেত বটে কিন্তু ওদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রকাশের নৃত্যনাট্য অপেরা পার্টি উঠে গেছে, নাচের স্কুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—এইটুকু মাত্র জানত আর শুনেছিল ওর বাবা ধর্মকর্মে মন দেওয়াতে প্রকাশ ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েছে ও অনেক পয়সা কামাচ্ছে। নিরঞ্জন এই রকম আশা করেছিল, কাজেই একটুও বিস্মিত হয়নি। অঞ্জনার শিল্পনিষ্ঠাকে মনে মনে ধিক্কার জানাল। বছরখানেক আগে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর পাড়ায় ফিরে এসে সে অঞ্জনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনে। কিন্তু তখন তার মনে হয়নি যে এব্যাপারে তার কিছু করবার আছে। কয়েক সপ্তাহ আগে অঞ্জনার একখানা চিঠি পেয়ে তার টনক নড়ে ও যেচে গিয়ে প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে। প্রকাশের অনুমতি নিয়ে অঞ্জনার সঙ্গে দেখা করে জানতে পারে যে বছর তিনেক হল প্রকাশ আবার নাচের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার এখন পয়সা ও প্রতিপত্তি বেড়েছে, এতল্লাটের মাতব্বর বলে স্বীকৃত। বড় বড় হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম। তাঁরা এই নাচের স্কুলের পেট্রন। নৃত্যনাট্যের দলটাও আবার তার অর্থে সঞ্জীবিত হয়েছে। নতুন ধরনের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করার পরি-কল্পনা করেছে, ইতিমধ্যে দু-একটি অনুষ্ঠিতও হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে অঞ্জনার কোনো ভূমিকা নেই। তাকে প্রকাশ ভালবাসে। তার জন্যে আলাদা আয়া, আলাদা গাড়ী, আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবসার এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হয়েছে অঞ্জনা। তাদের একমাত্র সন্তান কালিম্পং-এ বোর্ডিং স্কুলে ইংরেজি মিডিয়ামে সুশিক্ষা লাভ করছে। খুশীমত অঞ্জনা দুপুরবেলা মার্কেটিং করে, বিকেলবেলা কোনোদিন বেলুড় কোনোদিন ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যায়। স্বামীকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে তাকে নাচের

স্কুলের ভার কবে দেওয়া হবে। বিয়ের আগে প্রকাশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার শিল্পীসত্তাকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যেই সে তাকে বিয়ে করতে চায়। নিরঞ্জনের নাটকে রাজনীতি আছে; সাহিত্যরস নেই, শিল্প নেই। অঞ্জনা তার শিল্পীসত্তার বিকাশের জন্যই দাদার আদর্শ ত্যাগ করে প্রকাশের সহধর্মিণী হয়েছে। সে আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে এসেছে যে তাকে ভারত-খ্যাত নৃত্যশিল্পী করে গড়ে তোলার জন্যই প্রকাশ তাকে নিরঞ্জনের কবল থেকে মুক্ত করেছে। অরাজক অবস্থার অবসান হলেই প্রকাশ আবার দল গড়বে, তাকে নাচ শেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। অঞ্জনার পরিকল্পনায় ফাউষ্ট আর ওথেলোর নৃত্যরূপ দেওয়া হবে। শিশুচর্চা করতে করতেই এ নিয়ে দস্তুরমত পড়াশুনো করেছে অঞ্জনা, ছু-তিনটে স্ক্রিপট তৈরী করেছে। প্রকাশের সঙ্গে বসে আলোচনা করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রকাশের সময় হয়নি। ব্যবসা উপলক্ষে আজ বম্বে, কাল দিল্লী, পরশু মাদ্রাজ করতে করতে বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। নিজের ঘরের বড় আয়নার সামনে নাচ প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে অঞ্জনা দেখেছে তার দেহ আগের মত পেলব নেই, কোমরের মেদ কমানো যাচ্ছে না, পা ছুটো যেন ছন্দ লয় মেনে চলতে চাইছে না। অনেকবার বলে খবর পাঠিয়েও তবলচিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশ সব পাওয়া যাবে, সব হবে—এই আশা করে এতদিন কোনোরকমে দিন কাটিয়েছে অঞ্জনা। স্বামীর নাচের স্কুল আবার চালু হয়েছে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানও হতে চলেছে—এই খবর যেদিন পেল সেদিন থেকে সে নাচ প্র্যাকটিশ বন্ধ করে দিল। এ নিয়ে আর স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা তুলল না। স্বামীর অনেক অনুরোধেও নাট্যানুষ্ঠান দেখতে গেল না। ক্রমশ ঝিমিয়ে যেতে লাগল। বেড়ানো বন্ধ করল, মার্কেটিংও ভাল লাগে না। একদিন নেশার ঘোরে স্বামী তাকে জানিয়ে দিল যে তাদের পরিবারের কোনো বধূ অজস্র লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দেহভঙ্গী দেখাবে—

এ তার পিতা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। আর পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রীর নাচের মুজরোয় পেট চালানোর গ্লানি সে সহ্য করতে পারবে না। নাচের স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীতে অঞ্জনা থাকবে, কিন্তু অঞ্জনা কোনো দিন নাচবে না।

অঞ্জনা স্তম্ভিত হয়ে সব শুনল। প্রকাশ চলে গেলে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে-চিন্তে তারপর নিরঞ্জনকে চিঠি লিখল। নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অঞ্জনা খাপছাড়া দু-একটা কথা বলে একখানা চিঠিতে এই সব লিখে ওর হাতে দিল।

প্রকাশ বোঝাতে চেষ্টা করল নিরঞ্জনকে যে সংসার ও সন্তানের স্বার্থে অঞ্জনার এখন আর নাচ-গান থিয়েটার নিয়ে থাকা ঠিক হবে না। নিরঞ্জন না বুঝেও অঞ্জনাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল। অঞ্জনা চুপ করে রইল। কোনো কথার উত্তর দিল না। এর কয়েকদিন পরে শুনল বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য 'শ্যামা'র অনুষ্ঠান হচ্ছে। শ্যামার ভূমিকায় অঞ্জনা অনবদ্য—একথা অনেকবার প্রকাশের মুখে শুনেছে আর আনন্দ শিহরণে ও আপ্লুত হয়ে গেছে। সেদিন প্রকাশের কাছেই শুনল তার বয়স হয়েছে, মেদবৃদ্ধি হয়েছে, প্র্যাকটিশ নেই। বিদেশী বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে তাকে নায়িকার বেশে দাঁড় করানো চলে না। সেই সন্ধ্যা থেকে তার অসুখের সূত্রপাত। অঞ্জনা নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কল্পনার রাজ্যে নির্বাসিত করে অপমানের ব্যর্থতার জ্বালা ভুলতে চায়।